বিজ্ঞান-সরণি

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীরণজিৎ কুমার চক্রবর্তী

মধ্যশিক্ষাপর্ষদের নবপ্রবর্তিত সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী অনুসারে
দশমমান ও একাদশমান উভয়বিধ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর জন্য লিখিত
(Vide Notification No. SYL/1/62, dated 30th March, 1962)

বিজ্ঞান-সরণি

দ্বিতীয় ভাগ

(সপ্তম শ্রেণীর জন্য)

শ্রীরণজিৎকুমার চক্রবর্তী, বি. এস্‌সি., বি. টি.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্ত
উচ্চমাধ্যমিক রসায়ন বিজ্ঞান-শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্ত
মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন (মেন)এর বিজ্ঞান-শিক্ষক

ম্যাকমিলান এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড
২৯৪ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১৯৬৩

MACMILLAN AND COMPANY LIMITED
LONDON BOMBAY CALCUTTA MADRAS MELBOURNE

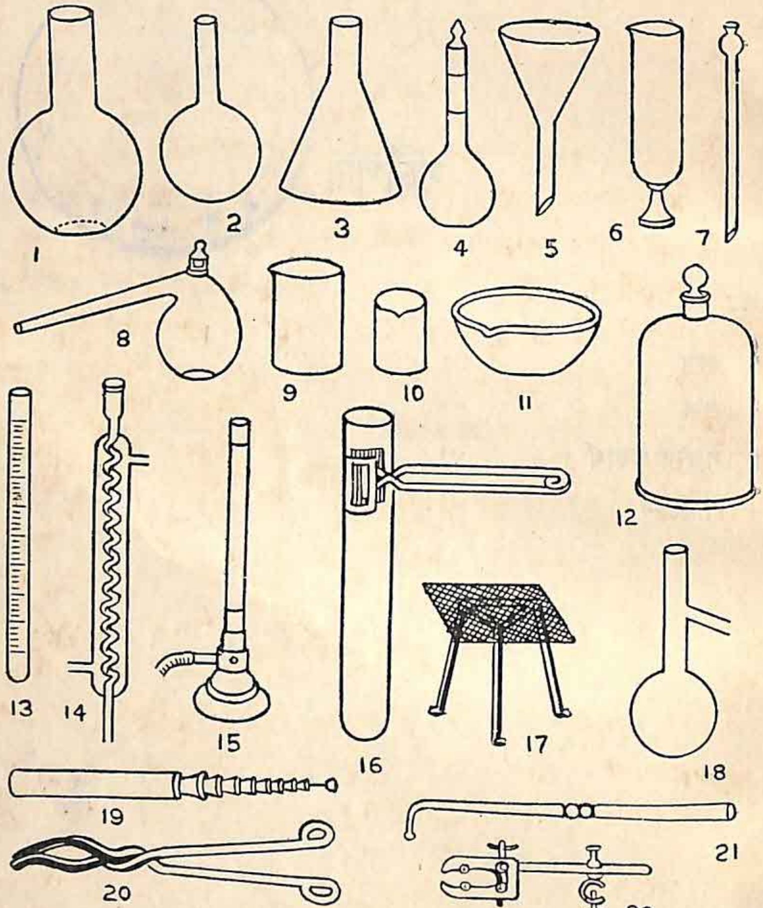
THE MACMILLAN COMPANY OF CANADA LIMITED
TORONTO

ST MARTIN'S PRESS INC
NEW YORK

First Edition 1962
Revised 1963

PRINTED BY B. MUKHERJI AT KALIKA PRESS PRIVATE LTD.
25 D. L. ROY STREET, CALCUTTA-6

সূচীপত্র



1. ফ্লাস্ক—চেপ্টা তল 2. ফ্লাস্ক—গোল তল 3. ত্রিকোণ ফ্লাস্ক 4. তরল মাপবার ফ্লাস্ক 5. ফানেল 6. তরল মাপবার মেজারিং গ্লাস 7. থিস্‌ল্ ফানেল 8. রিটর্ট 9. বীকার—বড় 10. বীকার—ছোট 11. বেসিন 12. বেল্-জার 13. মেজারিং টিউব 14. কণ্ডেন্সার 15. বুন্‌সেন বার্ণার 16. টেস্ট-টিউব (ধারকসহ) 17. ত্রিপদী (তারজালি সহ) 18. পাতন-পাত্র 19. কর্ক-বোরার 20. চিমটা 21. ফুৎনল 22. ধারক (clamp)

প্রথম অধ্যায়

বায়ু

পাঠক্রম ঃ বায়ুর উপাদান, বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত ও তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ, বায়ুর ওজন, শ্বাসকার্য, বায়ুচলাচল, বায়ুর শক্তি, দহনকার্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্গত।

এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি অতি সাধারণ পরীক্ষা—যথা, চুনের জলের উপর কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ক্রিয়া, ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট দ্রবণে অক্সিজেন শোষণ এবং আবদ্ধ বায়ুতে মোমবাতি দহন সংক্রান্ত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ বিশেষ সহায়ক হবে।

বায়ুমণ্ডল ঃ—ভূপৃষ্ঠের উপরে প্রায় 1288 কিলোমিটার পর্যন্ত স্তরে স্তরে বায়ু ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে ভূত্বকের উপরে প্রথম 8—9 কিঃ মিটার পর্যন্ত বায়ুস্তর খুবই ঘন। এই বায়ুরাশির মাঝে প্রতিনিয়ত কত বিচিত্র ঘটনা ঘ'টে চলেছে। প্রাণী ও উদ্ভিদ এই বায়ু থেকেই তাদের শ্বাসকার্য চালায়। নানা কাজে আমরা আগুন জ্বালাই। গৃহে বায়ু চলাচলের জন্য ব্যবস্থা রাখি। আবার বায়ুর শক্তিতে পালের সাহায্যে নৌকা চালাই, ঘুড়ি ওড়াই। এই সব ঘটনাগুলো নিত্য আমরা ঘটতে দেখি, আর তাদের সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে আমরা এই সব ঘটনার কারণ নির্ণয় করতে চেষ্টা করব।

1. বায়ুর উপাদান

বায়ুর উপাদান প্রধানতঃ দুইটি—**অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন**। এ ছাড়া আছে সামান্য জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড (অঙ্গারাম্ল) এবং খুবই সামান্য পরিমাণে আরও কয়েকটি গ্যাস্—যথা হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপটন্ ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রথম প্রশ্ন—বায়ু কি ?

তার উত্তর হ'ল—বায়ু প্রধানতঃ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি কয়েকটি স্বচ্ছ ও বর্ণহীন গ্যাসের মিশ্রণ।

পৃথিবীর যাবতীয় জড় বস্তুকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটির নাম **মিশ্র পদার্থ**, অপরটির নাম **যৌগিক পদার্থ**।

মিশ্র পদার্থের লক্ষণ এই যে তার মধ্যে দুই বা ততোধিক পদার্থ মিশে থাকে বটে কিন্তু প্রত্যেকটি পদার্থের নিজ নিজ ধর্ম বজায় থাকে।

আর যৌগিক পদার্থের লক্ষণ এই যে তার মধ্যে যে দুই বা ততোধিক পদার্থ মিশে থাকে তাদের নিজ নিজ ধর্ম বজায় থাকে না। সম্পূর্ণ একটি নূতন ধর্ম প্রকাশ পায়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক চিনি ও লবণের মিশ্রণ। স্বাদ নিলে উভয় বস্তুর স্বাদই মিশ্রণে পাওয়া যায়।

অপরদিকে জল একটি যৌগিক পদার্থ। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে এই পদার্থটি তৈরি হয়। **রাসায়নিক মিলন** বলতে আমরা বুঝি সেইরূপ মিলন যার ফলে পদার্থগুলির নিজ নিজ ধর্ম লোপ পেয়ে নতুন ধর্মবিশিষ্ট নতুন পদার্থ তৈরি হয়। এখন হাইড্রোজেন গ্যাসটিতে আগুন দিলে গ্যাসটি জ্বলে ওঠে আবার অক্সিজেন গ্যাসটি জ্বলে না, কিন্তু অপরের জ্বলা কাজে সাহায্য করে। অথচ জলের এ দুটো ধর্মের কোনটাই নেই। সুতরাং **জল মিশ্র পদার্থ নয়—জল যৌগিক পদার্থ**।

এইবার আমরা দেখব যে বায়ুর উপাদানগুলির নিজ নিজ ধর্ম বজায় আছে কি না আর তার ফলে আমাদের কি সুবিধা হয়েছে।

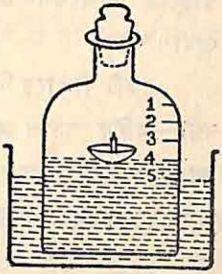
বায়ুর উপাদান—অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন আয়তন সংযুক্তি— অক্সিজেন $\frac{1}{5}$ অংশ, নাইট্রোজেন $\frac{4}{5}$ অংশ। বায়ুতে স্বল্প পরিমাণে জলীয় বাষ্প ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতি।

5 ভাগ বায়ুর মধ্যে যে মোটামুটি 1 ভাগ অক্সিজেন ও 4 ভাগ নাইট্রোজেন আছে তা নিম্নলিখিত পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় :—

(1) **মোমবাতির দহন-পরীক্ষা**—এই পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি জিনিস প্রয়োজন। একটি বড়ো গামলার আকারের খোলা মুখ কাঁচপাত্র, একটি ছিপি-ওয়ালা বেল-জার, একটি ছোট বাটির মত আকারের চীনামাটির পাত্র (মুচি), একখণ্ড মোমবাতি (8 সেন্টিমিটার লম্বা), একটি পাটকাঠি ও দেশলাই এবং খানিকটা জল, কাগজ ও আঁঠা।

এইবার টেবিলের ওপর বড়ো কাঁচপাত্রটি রেখে তার মাঝে প্রায় অর্ধেক অংশ

জলে পূর্ণ করব। মোমবাতিটা না জেলে চীনামাটির পাত্রে বসিয়ে ঐ জলের উপর ভাসিয়ে দেব। তার উপর, বেল-জারের ছিপিটা খুলে নিয়ে বেল-জারটি জলের মধ্যে বসিয়ে দেব। জলতলের উপরে বেল-জারের যে অংশ অবস্থিত তার মধ্যে বায়ু আছে। একখণ্ড সরু শাদা কাগজ ঐ শূন্য অংশের মাপে কেটে নিয়ে তাকে সমান পাঁচটি ভাগে ভাগ ক'রে চিহ্নিত করব। আঁঠা দিয়ে ঐ কাগজটি বেল-জারের গায়ে এমন ভাবে এঁটে দেব যাতে বেল-জারের আপাতশূন্য অংশটি ঠিক পাঁচটি ভাগে ভাগ হয়। এইবার বেল-জারটি তুলে এনে মোমবাতিটা ধরিয়ে দেব। তার পর দ্রুত বেল-জারটি দিয়ে মোমবাতিটা ঢাকা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেল-জারের উপরের ছিপিটা এঁটে বসিয়ে দেব। বেল-জারের মধ্যে বাতিটা কিছুক্ষণ জ'লে, ধীরে ধীরে নিভে যাবে। প্রথমেই বেল-জারের ভিতরের জলতল কিছুটা নেমে যেতে দেখব। তারপর যতই বেল-জারটি ঠাণ্ডা হতে থাকবে ততই দেখব বেল-জারের ভিতরের জলতল উপরে উঠছে। পরীক্ষাটি খুব সতর্ক হয়ে ক'রলে এবং অনেকটা সময় বেল-জারটা ঠাণ্ডা হ'তে দিলে দেখা যাবে, ভিতরের জলতলটা দাগ দেওয়া পাঁচটি ভাগের একটি ভাগ পর্যন্ত উঠে গেল। এখন একটি জলন্ত পাটকাঠিকে যদি দ্রুত ছিপি খুলে বেল-জারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তৎক্ষণাৎ জলন্ত কাঠিটি নিভে যাবে। যতবারই এই সমগ্র পরীক্ষাটি করা যাবে ততবারই ঐ একইরূপ ফল পাওয়া যাবে।

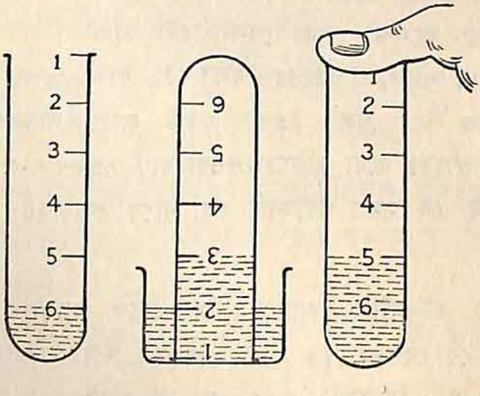


এখন এই ঘটনাটিকে আমরা কি ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? আমরা দেখলাম যে বেল-জারের মধ্যে চারভাগ বায়ু থাকতেও দীপটি নিভে যায়। তাহলে এই সিদ্ধান্তই করব যে ঐ চারভাগের বায়ু মোমবাতির দহন-কার্যে কোন সাহায্য করে না। বায়ুর পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র মোমবাতির দহন-কার্যে সহায়তা ক'রে থাকে। মোমবাতির পরিবর্তে অন্য যে কোন দাহ্য-বস্তু—যথা, ফস্‌ফরাস্, ম্যাগনেসিয়াম-তার ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা ক'রলেও অনুরূপ ফলই পাওয়া যায়। তাহ'লে আমরা বলতে পারি বায়ুর আয়তনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ খুবই সক্রিয়—আর চার ভাগ নিষ্ক্রিয়, যেহেতু তা দহন-কার্যে সহায়তা করে না।

'ল্যাভোয়াসিয়ে' নামক ফরাসী বৈজ্ঞানিক দহন-কার্যে সহায়ক বায়ুর ঐ সক্রিয় অংশটির নাম দিয়েছিলেন 'ভাইটাল এয়ার' অর্থাৎ 'প্রাণরক্ষক বায়ু' এবং অপর অংশের নাম দিয়েছিলেন 'এজোট' অর্থাৎ 'যাতে প্রাণরক্ষা হয় না'। পরবর্তীকালে ঐ দুটি গ্যাস যথাক্রমে **অক্সিজেন** ও **নাইট্রোজেন** নামে পরিচিত হয়েছে। **অক্সিজেন দহন-কার্যে সহায়তা করে—নাইট্রোজেনের সে শক্তি নেই।**

(2) **ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট দ্রবণ দ্বারা পরীক্ষা**—এই পরীক্ষাটিও বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের উপরোক্ত (1 : 4) পরিমাণে উপস্থিতি প্রমাণ করে।

একটি বীকারে কিছুটা পাইরোগ্যালেট দ্রবণ নিয়ে তার সঙ্গে কিছুটা ক্ষারপদার্থ, যথা—কষ্টিক পটাশ বা কষ্টিক সোডার দ্রবণ মেশান হ'ল। এই মিশ্রণটির নামই ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট দ্রবণ। এই দ্রবণটির অক্সিজেন গ্যাস শোষণ করার ক্ষমতা আছে। এখন একটি শক্ত কাঁচের পরীক্ষা-নলের (Test tube—টেষ্ট টিউব)



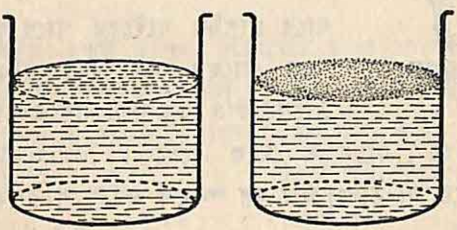
মধ্যে কিছুটা ঐ ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট দ্রবণ ঢেলে নিলাম। দ্রবণটির উপরের অংশে পরীক্ষা-নলটিতে বায়ু রয়েছে। ঐ অংশটি দাগ দিয়ে সমান 5টি অংশে ভাগ ক'রে নিলাম। এবার পরীক্ষা-নলটির মুখে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চাপা দিয়ে খুব জোরে ঝাঁকিয়ে নিলাম। আঙ্গুল জোরে চেপে রেখেই ঐ পরীক্ষা-নলটি একটি বীকারের জলে উপুড় করে বসিয়ে দিয়ে আঙ্গুলের চাপ সরিয়ে নিলাম। দেখা গেল, তৎক্ষণাৎ খানিকটা জল পরীক্ষা-নলের মধ্যে উঠে গেল। এইবার পুনরায় পরীক্ষা-নলের

মুখটি আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে বাইরে এনে সোজা করে দাঁড় করানো হ'ল। দেখা গেল, পরীক্ষা-নলে পূর্বোক্ত দ্রবণ ও জলের মিশ্রণ উঠে দাগ কাটা অংশের 1 ভাগ মাত্র পূর্ণ করেছে। বাকি 4টি ভাগ তখনও খালি আছে। এইবার একটি জ্বলন্ত পাটকাঠি, ঐ পরীক্ষা-নলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে কাঠিটা সঙ্গে সঙ্গে নিভে যাবে।

এই পরীক্ষার পরে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, **বায়ুর এক-পঞ্চমাংশ অক্সিজেন গ্যাস আর বাকি চারি-পঞ্চমাংশ নাইট্রোজেন।**

পরীক্ষা-নলে ক্ষারীয় পাইরোগ্যালেট দ্রবণ নিয়ে, পরীক্ষা-নলটি না ঝাঁকিয়ে মধ্যেকার বায়ুপূর্ণ স্থানে জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করালে, কাঠির আগুন তৎক্ষণাৎ নিভে যায় না। অর্থাৎ ঐ স্থানে তখনও অক্সিজেন গ্যাস বর্তমান এবং ঐ গ্যাস দহন-কার্যে সহায়তা করে।

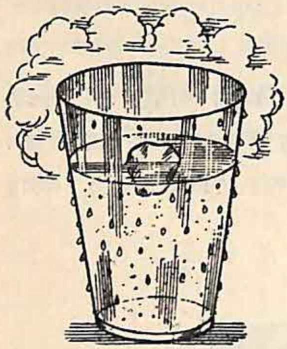
(3) **চুনের জলের পরীক্ষা**—একটি পাত্রে কিছুটা পাথুরে চুন নেওয়া হ'ল। তার মধ্যে অনেকটা পরিমাণ জল আস্তে ঢেলে দেওয়া হ'ল। প্রথমটা জল টগ্‌বগ্ করে ফুটবে, ধোঁয়া হবে আর শুকনো চুনটা কাদার মতো হয়ে যাবে। এটাই



হ'ল কলিচুন—যা নাকি আমরা দেয়ালে 'চুনকাম' করতে ব্যবহার করি। রাসায়নিক ভাষায় এর নাম ইংরাজীতে ক্যাল্‌সিয়াম-হাইড্রক্সাইড। জল দেওয়া সেই চুনের সামান্যই জলে দ্রবীভূত হবে। বাকি চুনটা থিতিয়ে যখন নিচে পড়ে যাবে তখন উপরে স্বচ্ছ দ্রবণ থাকবে। চুনের উপরের এই স্বচ্ছ জলকেই 'চুনের জল' বলে। একটি চওড়া-মুখ পাত্রে (মাটির পাত্র হ'লেও চলে) ঐ চুন-জল দু'একদিন রেখে দেওয়া হ'ল। দেখা যাবে চুনের জলের উপর শাদা সর পড়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ঐ শাদা সরটি চুনাপাথর বা চা-খড়ি বা মার্বেল পাথর যার রাসায়নিক

নাম ক্যালসিয়াম-কার্বনেট। এখন চুনের জল বা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড-এর সঙ্গে একমাত্র কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ক্রিয়ার ফলেই ঐ চুনাপাথর তৈরি হতে পারে। তাহ'লে আমরা বলতে পারি, **বায়ুতে অবশ্যই কার্বন-ডাই-অক্সাইড আছে।**

এ সম্পর্কে আরও হু-একটা পরীক্ষা করা যায়। চুনের জল একটি পাত্রে নিয়ে তার মধ্যে রবার-নল ও ফুট-পাম্প সাহায্যে অনেকক্ষণ ধরে বায়ু চালালেও ঐ চুন-জল ঘোলা হয়ে যায়। চুনাপাথর বা চা-খড়ি জলে মিশে যায় না। ছোট কণার আকারে জলের মধ্যে ভেসে থাকে বলে'ই জলটা ঘোলাটে হয়।

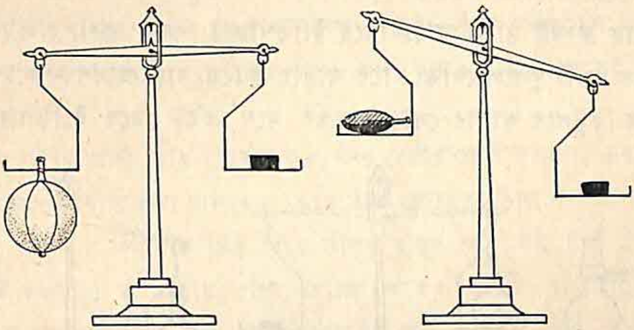


(4) **বায়ুতে জলীয় বাষ্প**—একটি কাঁচের গ্লাস নেওয়া হ'ল। গ্লাসটির বাইরের দিকটি শুক্‌নো কাপড় বা তোয়ালে দিয়ে বেশ ক'রে মুছে নেওয়া হ'ল, যেন তাতে কোনো জল না লেগে থাকে। এবার একখণ্ড বরফ এনে সাবধানে ঐ গ্লাসের মধ্যে রেখে দিলাম এবং তাতে কিছুটা জলও ঢেলে দিলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখা যাবে গ্লাসটির বাইরের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা জমে আছে। এর কারণ কি? ঐ জলকণা গ্লাসের কাঁচ ভেদ করে বাইরে আসতে পারে না। তাহ'লে ঐ জল অবশ্যই বায়ুমণ্ডল থেকে এসেছে। অর্থাৎ **বায়ুতে অবশ্যই জলীয় বাষ্প আছে যা ঠাণ্ডা গ্লাসের স্পর্শে জলে পরিণত হয়ে গ্লাসের গায়ে লেগে যায়।**

এ পর্যন্ত যে পরীক্ষাগুলো আমরা করেছি তার থেকে এই সিদ্ধান্ত আমরা ক'রতে পারি যে **বায়ুতে মিশে আছে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প নামক প্রধান চারটি গ্যাসীয় পদার্থ। এই গ্যাসগুলোর কোন রং নেই। তাই বায়ু বর্ণহীন। আর এই উপাদান-গুলির যার যার ধর্মটি বজায় আছে বায়ুর মধ্যে।** সুতরাং **বায়ু অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প—প্রধানতঃ এই চারটি গ্যাসের মিশ্রণ।**

2. বায়ুর ওজন

বায়ু কয়েকটি বর্ণহীন গ্যাসের মিশ্রণ। বায়ুকে চোখে দেখা যায় না। ধীরে বায়ু প্রবাহিত হলে বা ঝড় বইলে আমরা বায়ুর অস্তিত্ব অনুভব করি। ঐ বায়ু তখন তার চার পাশের বস্তুর উপর চাপ দেয়। আবার যে সকল বস্তুর ওজন আছে তারাই চাপ দিতে পারে। নিচের পরীক্ষা তুটির দ্বারা বায়ুর ওজন আমরা বুঝতে পারব।



প্রথম পরীক্ষা—একটি ফুটবল 'ব্লাডারে'র মধ্যে পাম্পের সাহায্যে যতটা সম্ভব বায়ু ঢুকিয়ে ব্লাডারের মুখের নল খুব এঁটে বেঁধে দেওয়া হ'ল। বায়ুপূর্ণ 'ব্লাডার'টি এবার একটি ভালো দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হ'ল। 'ব্লাডারে'র মুখটি খুলে দিলে ভিতরের বায়ু বেরিয়ে যাবে। এবার যদি 'ব্লাডার'টিকে ওজন করা যায়, দেখা যাবে এই ওজন আগের চেয়ে সামান্য কম। ওজনের এই পার্থক্যই ব্লাডারের ভিতরের বায়ুর ওজন।

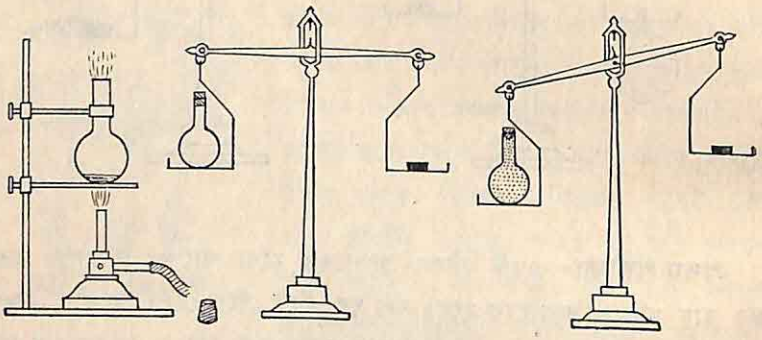
এই পরীক্ষাটি সম্বন্ধে একটি কথা বলার আছে। 'ব্লাডারে' বায়ু ঢোকালে আয়তন বেড়ে গেল, তাতে ব্লাডারটির ওপর যতটা বায়ুর চাপ পড়ে, সংকুচিত অবস্থায় তার থেকে কম চাপ পড়ে। সুতরাং সংকুচিত অবস্থায় যতটা হালকা দেখানো উচিত ব্লাডারটি ওজনে ততটা দেখায় না। কিন্তু বায়ুর যে কিছুটা ওজন আছে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। অবশ্য পরীক্ষাটি 'বায়ুশূন্য স্থানে' করাই উচিত।

এই পরীক্ষাটি 'সাইকেলে'র টিউব নিয়ে অথবা বাত-পাম্পএর সাহায্যে 'ষ্টপককৃযুক্ত' 'কাঁচের গ্লোব' থেকে বায়ু সরিয়ে নিয়েও দেখানো যায়। কাঁচের

গ্লোব-এর ক্ষেত্রে সুবিধা এই যে বায়ুপূর্ণ বা বায়ুশূন্য উভয় অবস্থায়ই তার আয়তন ঠিক থাকে। সুতরাং গ্লোব-এর উপর বায়ুর ঊর্ধ্ব-চাপের তারতম্য হয় না।

দ্বিতীয় পরীক্ষা—একটি কাঁচের ফ্লাস্কে সামান্য জল নেওয়া হ'ল। এবার ফ্লাস্কে তাপ দিয়ে ভিতরের জলের প্রায় সবটাই বাষ্পাকারে বের করে দিয়ে, তখনই কর্ক দিয়ে ফ্লাস্কের মুখটি এঁটে দেওয়া হ'ল। এমন ভাবে কর্কটি এঁটে দেওয়া হবে যাতে বাইরে থেকে বায়ু ভিতরে না ঢুকতে পারে। বাষ্পের চাপে ভিতরের বায়ু ফ্লাস্কের বাইরে বেরিয়ে গেছে।

এবার ফ্লাস্কটি ঠাণ্ডা ক'রে নিয়ে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হ'ল। তারপর ধীরে ধীরে কর্কটি খুললে বোঝা যাবে আবার ফ্লাস্কে বায়ু প্রবেশ করছে। কর্কটি খুলে নিয়ে কিছুপরে আবার সেটা ফ্লাস্কের মুখে এঁটে দিয়ে দাঁড়িপাল্লায় ওজন



নেওয়া হ'ল। দেখা যাবে, ফ্লাস্কের ওজন বেড়ে গেছে। ফ্লাস্কের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করার জন্যই এই ওজন বেড়েছে।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম **বায়ুর ওজন আছে।**

3. শ্বাসকার্য

আমরা জানি বাষ্পের শক্তিতে ইঞ্জিন চলে। বায়ুর উপস্থিতিতে কয়লা পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায় সেই তাপশক্তি জলকে বাষ্পে পরিণত করে। আর এই বাষ্পের শক্তিতে ইঞ্জিন চলে। জীবদেহের পক্ষেও এই তাপের প্রয়োজন। জীবদেহে এই তাপশক্তির সৃষ্টি হয় দেহের ভিতরে খাদ্যবস্তুর দহনের ফলে। খাদ্যবস্তুর দহনের জন্য অম্লজান (অক্সিজেন) আবশ্যক। জীব ঐ অম্লজান নিয়তই বায়ু থেকে

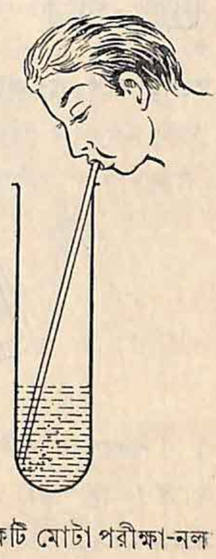
গ্রহণ করে। **জীব প্রশ্বাসের সঙ্গে যে বায়ু গ্রহণ করে তা দেহের ভিতরে বিভিন্ন পথে রক্তের ভিতর দিয়ে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ও তাপ উৎপন্ন করে।** তাপ দেহের উষ্ণতা বজায় রাখে ও দেহে শক্তি যোগায়। এই শক্তির জোরেই জীব বেঁচে থাকে, কাজ করে।

প্রশ্বাস বায়ু (অর্থাৎ যে বায়ু গ্রহণ করি)—এই বায়ুতে থাকে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সামান্য জলীয় বাষ্প ও সামান্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড।

নিঃশ্বাস বায়ু (অর্থাৎ যে বায়ু ত্যাগ করি)—এতে অক্সিজেন কমে যায়, জলীয় বাষ্প ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভাগ বেড়ে যায়। নাইট্রোজেনের কম-বেশি হয় না।

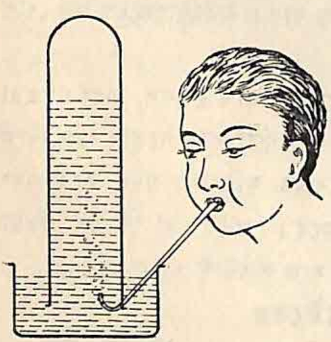
কোন কোন প্রাণী তার দেহের ত্বক, উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী ফুস্‌ফুস্‌, এবং মাছেরা ফুল্‌কার সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালায়। আর গাছ প্রধানতঃ তার পাতার ছিদ্র দিয়ে এই কার্য চালায়। পাতার ছিদ্র দিয়ে উদ্ভিদ বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প ত্যাগ করে। প্রাণী বা উদ্ভিদ যতটা নাইট্রোজেন প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে নিঃশ্বাসের সঙ্গে ততটাই ত্যাগ করে।

(ক) **নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অস্তিত্বের পরীক্ষা**—একটি পরীক্ষা-নলে স্বচ্ছ চুনের জল নিয়ে তার মধ্যে একটি কাঁচনলের সাহায্যে ফুঁ দেওয়া হ'ল। মুখের ভিতরের এই বায়ুই নিঃশ্বাস বায়ু। এই বায়ু জলের মধ্যে বুদবুদ সৃষ্টি ক'রে মিশে যেতে লাগল। কয়েকবার ফুঁ দেওয়ার পরই দেখা গেল, স্বচ্ছ চুনের জল ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি চুনের জলের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইড মেশালে চুনের জল ঘোলাটে হয়। সুতরাং **আমাদের নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে।** চুনের জল বেশ তাড়াতাড়ি ঘোলা হয় বলে একথাও বলা যায় যে নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভাগ বেশি থাকে।



(খ) **নিঃশ্বাস বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ**—একটি মোটা পরীক্ষা-নল জলপূর্ণ ক'রে তাকে অপর একটি বড়ো পাত্রে জলের মধ্যে উপুড় ক'রে বসানো হ'ল।

ঐ নলের মধ্যে এখন আর কোন বায়ু নেই। এইবার একটি বাঁকা কাঁচনল নিয়ে তার (চিত্রানুযায়ী) একপ্রান্ত পরীক্ষা-নলে ঢুকিয়ে দিয়ে অপর প্রান্তে মুখ লাগিয়ে রাখতে হবে। এবার নাক দিয়ে প্রশ্বাস বায়ু টেনে নিয়ে একটুক্ষণ রেখে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস বায়ু ঐ নল-পথে পরীক্ষা-নলে ঢুকিয়ে দিতে হবে। বায়ু জল থেকে হালকা বলে জল সরিয়ে পরীক্ষা-নলে বায়ু ভর্তি হবে। সবটা জল পরীক্ষা-নল থেকে বেরিয়ে গেলে, পরীক্ষা-নলের মুখটা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে পরীক্ষা-নলটি বাইরে আনতে হবে। একটি জলন্ত পাটকাঠি এইবার ঐ পরীক্ষা-নলে ঢুকিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কাঠির আগুনটা নিভে যাবে।



সুতরাং দেখা গেল, নিঃশ্বাসবায়ু দহন-কার্যে কোন সহায়তা করে না অর্থাৎ **নিঃশ্বাস বায়ুতে অক্সিজেন খুবই কম।**

(গ) **নিঃশ্বাস বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি**—একটি পরিষ্কার আয়নার উপরে যদি নিঃশ্বাস ত্যাগ করা যায়, দেখা যাবে কাঁচের উপরটা ঘোলাটে হ'য়ে গেল। নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে জলীয় বাষ্প বের হয়, সেটাই কাঁচের ঠাণ্ডা তলের স্পর্শে এসে জমে যায়, এবং আয়নার কাঁচকে অস্বচ্ছ ক'রে তোলে।

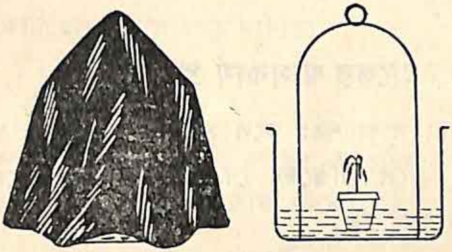


শীতকালে বাইরের বায়ু থাকে খুব ঠাণ্ডা। মুখ থেকে হাঁ ক'রে হাওয়া ছাড়লে, ঐ হাওয়া বাইরে এসে ধোঁয়ার রূপ নেয়। ঐ ধোঁয়া ঘনীভূত জলীয় বাষ্প। অর্থাৎ **নিঃশ্বাস বায়ুর সঙ্গে আমাদের দেহের ভিতর দিয়ে জলীয় বাষ্পও বাইরে বেরিয়ে আসে।**

(ঘ) **দেহের ভিতরে বায়ুর দহনের ফলে তাপের সৃষ্টি**—হাতের তালুর বিপরীত পাশে যদি নিঃশ্বাস ফেলা যায়, দেখা যাবে ঐ স্থানে গরম বোধ হচ্ছে। সুতরাং এতে প্রমাণ হয় যে, **দেহের ভিতরে অক্সিজেনের মৃদু দহনের ফলে নিঃশ্বাস বায়ু উষ্ণ হয়ে পড়ে।**

অক্সিজেন-শূন্য বায়ুতে জীবের শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা

প্রথম পরীক্ষা—টবশুদ্ধ একটি ছোট চারাগাছকে একটি পাত্রে জলের মধ্যে বসিয়ে রাখা হ'ল। তার উপর একটি বড়ো বেল-জার দিয়ে ঢাকা দেওয়া হ'ল। সম্পূর্ণ জিনিসটা এবার একটি কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হ'ল।



কয়েক দিন পর কালো কাপড়ের ঢাকনা সরিয়ে দেখা যাবে, গাছটির পাতাগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। বেল-জার দিয়ে ঢাকা দেওয়াতে গাছ বাইরে থেকে কোনো অক্সিজেন পায় না। আবার সূর্যালোক পেলে গাছ নিজেই অক্সিজেন তৈরি ক'রতে পারে। কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা দিলে গাছের অক্সিজেন তৈরি করার সে শক্তিও থাকে না। ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই অক্সিজেনের অভাব ঘটে। কালো কাপড়শুদ্ধ বেল-জার সরিয়ে নিয়ে চারাগাছ সমেত টবটিকে রৌদ্রে রেখে দিলে আবার পাতার সজীবতা ফিরে আসে।



দ্বিতীয় পরীক্ষা—একটি ছোট্ট ব্যাং ধ'রে তাকে একটি পাত্রে রেখে বেল-জার ঢাকা দেওয়া হ'ল। কিছুক্ষণ পরে অক্সিজেনের অভাবে ব্যাংটি ছট্‌ফট্ ক'রে মারা যাবে।

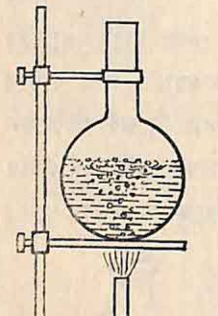
এর কারণ এই যে ঐ উভয় ক্ষেত্রে পাত্রের ভিতরের বায়ুতে যতটা অক্সিজেন

ছিল উদ্ভিদ বা প্রাণী তাতে কিছুক্ষণ শ্বাসকার্য চালাতে পারে। প্রশ্বাস নিতে নিতে ও নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে ক্রমশঃ আবদ্ধ বায়ুর সবটুকু অক্সিজেন শেষ হয়ে যায়। পাত্রের মধ্যে তখন প'ড়ে থাকে নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প। এর কোনোটাই শ্বাসকার্যের সহায়তা করে না। ফলে জীব শ্বাসরুদ্ধ হয়ে নিস্তেজ হয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত মারা পড়ে।

স্থলে যে সব জীব বাস করে তারা সরাসরি বায়ুর অক্সিজেন নিয়ে শ্বাসকার্য চালায়। কিন্তু যে সব জীব জলে বাস করে তাদের শ্বাসকার্য চলে জলে দ্রবীভূত বায়ুর সাহায্যে।

জলচর প্রাণী ঃ মাছের শ্বাসকার্য প্রণালী

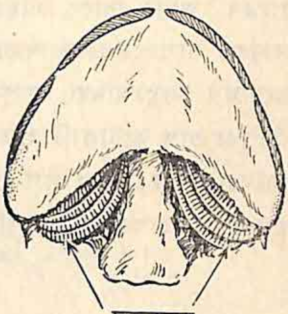
জলচর প্রাণীরা সাধারণতঃ জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ ক'রে তাদের শ্বাসকার্য চালায়। জলে অক্সিজেন যে মিশে থাকতে পারে তা একটি সহজ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায়।



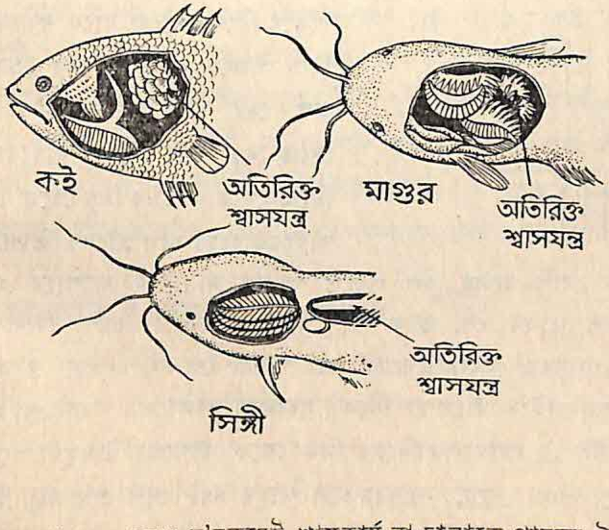
পরীক্ষা—একটি কাঁচের ফ্লাস্কে বা বীকারে জল নেওয়া হ'ল। এইবার পাত্রটিতে বুনসেন দীপ বা স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে তাপ দেওয়া হ'ল। দেখা যাবে জলের ভিতর দিয়ে বুদ্‌বুদ বেরিয়ে আসছে। জলের মধ্যকার অক্সিজেন তাপ পেয়ে আয়তনে বেড়ে যায়; তখন তা আর জলের মধ্যে থাকতে পারে না। বুদ্‌বুদের আকারে জলের উপরে উঠে এসে বায়ুতে মিলিয়ে যায়।

মাছের শ্বাসকার্য—মাছের ফুস্‌ফুস্ নেই। মাছেরা ফুল্‌কার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। মাছের মাথার দু'পাশে ঢাকনার মতো হাড়ের দুটি আবরণ থাকে। একে কান্‌কো বলে। ঐ কান্‌কো দুটির নিচে বাঁকা হাড়ের উপর সাজানো এক সারি চিরুণীর দাঁড়ার মতো বা ঝালরের মতো গাঢ় লাল বর্ণের পদার্থ থাকে। তাকেই বলে মাছের ফুল্‌কা। ঐ ফুল্‌কার মধ্যে খুব পাতলা আবরণের রক্তবহা নালী থাকে বলেই ফুল্‌কার রং ঐ রকম লাল দেখায়। তাজা মাছের ফুল্‌কা খুবই লাল দেখায়। মাছ ম'রে গেলে ধীরে ধীরে ঐ ফুল্‌কার লাল রং নষ্ট

হয়ে যায়। মাছের নাকের ছিদ্র আছে সত্য, কিন্তু শ্বাসকার্যে ঐ ছিদ্র তাদের কোনো কাজেই লাগে না। জলের মধ্যে মাছ মুখ দিয়ে জল টেনে নেয় মুখের গহ্বরে। তারপর মুখ বন্ধ ক'রে মুখগহ্বরের তলদেশটা উঁচু ক'রে সেই জলের উপর চাপ দেয়। চাপের ফলে জল ফুল্‌কার মধ্যে ঢুকে পড়ে। জলের মধ্যে যে অম্লজান (অক্সিজেন) মিশে থাকে তা ঐ ফুল্‌কার রক্তবহানালীর পাতলা আবরণের মধ্য দিয়ে ভিতরের রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এইভাবেই সব মাছ শ্বাসকার্য চালায়। অক্সিজেনশূন্য জল কান্‌কোর খোলা-পথে বাইরে বেরিয়ে যায়।



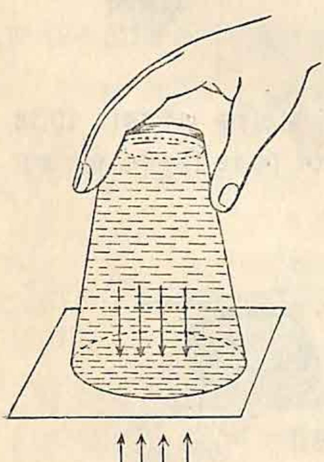
ফুল্‌কা ছাড়াও কই, শিঙ্গি প্রভৃতি মাছের অতিরিক্ত একপ্রকার শ্বাসযন্ত্র থাকে। তার ফলে তারা বাইরের বাতাস টেনে নিয়েও কিছুক্ষণ শ্বাসক্রিয়া



চালিয়ে যেতে পারে। তবে দু'রকমেই শ্বাসকার্য না চালাতে পারলে ঐ সব মাছ বেশিক্ষণ বেঁচে থাকে না।

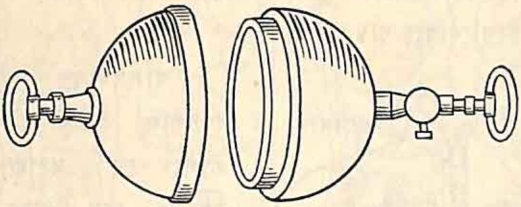
বায়ুর চাপ ও শ্বাসকার্য

আমরা জানি বায়ু যখন বইতে থাকে তখন তার চাপে গাছপালা হেলে পড়ে। অর্থাৎ তাতে বায়ুর চাপ দেবার ক্ষমতা আছে বোঝা যায়। নিশ্চল বায়ুরও চাপ দেওয়ার ক্ষমতা আছে। ঐ চাপ প্রত্যেক বস্তুর উপর নিয়তই রয়েছে। তবু আমরা তা বুঝতে পারি না। কারণ বস্তুর ভিতরের বায়ুর চাপ ও উপরের চাপ কাটাকাটি হয়ে যায়। আমাদের দেহের ভিতর বায়ু আছে। তাই আমরা উপরের বায়ুর চাপ বুঝতে পারি না। দুইটি সহজ পরীক্ষা করলে বায়ুর এই চাপ দেওয়ার ক্ষমতা কত বেশি তা আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারব।



প্রথম পরীক্ষা—একটি জল ভর্তি গ্লাস একখানা পোষ্টকার্ড (বা শক্ত কাগজ) চাপা দিয়ে তার উপর হাত চাপা দিয়ে অপর হাতের সাহায্যে উপুড় করা হ'ল। এবার একহাতে গ্লাসটি ধ'রে রেখে আস্তে আস্তে কার্ডের উপর থেকে হাতের চাপটি সরিয়ে নিলেও দেখা যাবে কাগজটি বা জল নিচে পড়ছে না। গ্লাসের ভিতরে আছে জল, সেই জল পোষ্ট-কার্ডটির উপর চাপ দিচ্ছে নিচু দিকে আবার বাইরের বায়ু চাপ দিচ্ছে পোষ্ট-কার্ডটির নিচু থেকে উপরদিকে। বাইরের বায়ুর চাপ গ্লাসের ভিতরের জলের চাপ থেকে বেশি বলেই জল পড়তে পারছে না। এই ব্যাপারে একটা কথা আমরা মনে রাখব যে, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থে চাপ দিলে সে চাপ তরল বা গ্যাসের যেখান থেকেই বা যেদিক থেকেই দেওয়া হোক্ না কেন, উপরে, নিচে, ডাইনে, বাঁয়ে সব দিকেই সমানভাবে লাগে। তাইতো বায়ুমণ্ডলের সমস্ত চাপটিই ঐ কাগজের নিচের দিক থেকে কাগজের উর্ধ্বমুখী হয়ে পড়ছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সমুদ্রসমতলে বায়ুর এই চাপ প্রায় $9\frac{1}{2}$ মিটার লম্বা নলের ভিতরের জলস্তম্ভকে ধ'রে রাখতে পারে। কিন্তু পারদ খুব ভারি তরল ব'লে মাত্র 76 সেন্টিমিটার লম্বা নলের ভিতরের পারদস্তম্ভকে ধ'রে রাখতে পারে।

দ্বিতীয় পরীক্ষা—এই পরীক্ষাটির জন্য এক বিশেষ ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। পিতলের দুটো শক্ত অর্ধ-গোলক এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে একটি আর একটির মুখের খাঁজে ঠিকমত এঁটে যায় এবং একটা পূর্ণ গোলকের মতো হয়। চর্বি (বা গ্রীজ) দিয়ে এঁটে দিলে বাইরের বাতাস ঐ পথে গোলকের মধ্যে ঢুকতে পারে না। অর্ধ-গোলক দুটির একটির সাথে একটা আংটা লাগানো



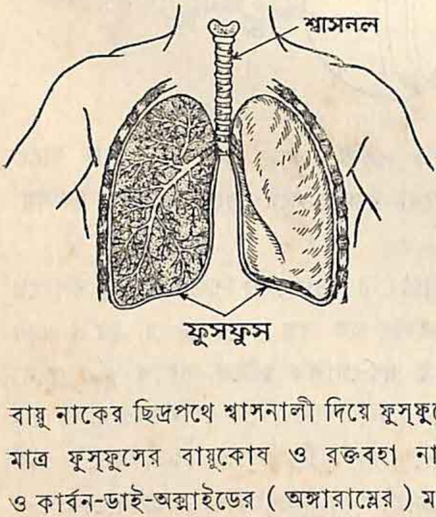
থাকে। অপর অর্ধ-গোলকের একদিকে একটি নলযুক্ত স্টপ-কক লাগান থাকে এবং একটি আংটা প্যাঁচকলের সাহায্যে নলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

স্টপ-কক খুলে বাত-পাম্পের সাহায্যে ঐ গোলকের ভিতরের বায়ু নলপথে টেনে বের ক'রে আনা হয় এবং ঐ স্টপ-কক বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। এখন দুপাশের দুটি আংটা ধরে টানলেও ঐ অর্ধ-গোলক দুটিকে সহজে খুলে ফেলা যায় না। কিন্তু প্যাঁচকল খুলে ষ্টপ-ককের চাবি খুলে দিলে গোলকের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে, তখন অতি সহজেই অর্ধ-গোলক দুটিকে পৃথক করা যায়। এই পরীক্ষাটি গ্যেরিক নামক এক বিজ্ঞানী জার্মানির ম্যাগ্‌ডিবার্গ শহরে প্রথম দেখান—সেই জন্য এই অর্ধ-গোলক দুটির নাম করা হয় ম্যাগ্‌ডিবার্গের অর্ধ-গোলক।

মানবদেহের ভিতরে ফুস্‌ফুসের শ্বাসকার্য

আমাদের বুকের মধ্যে কতকগুলো হাড় দিয়ে একটি পাখির খাঁচার আকারে আধার তৈরি। এরই নাম **বক্ষ-পিঞ্জর**। এই পিঞ্জরের হাড়গুলি পিছনের দিকে শিরদাঁড়ার সঙ্গে আর সামনের দিকে বুকের হাড়ের সঙ্গে জোড়া থাকে। পিঞ্জরের বা পাঁজরার হাড়গুলি মাংসপেশী দ্বারা ঢাকা থাকে। পিঞ্জরের তলাটা মাংসপেশী দ্বারা নির্মিত একখানা পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা। এই পর্দার নিচেই উদর-গহ্বর বা পেট। ঐ পর্দাটির নাম **মধ্যচ্ছদা**। মধ্যচ্ছদার উপরে বক্ষ-পিঞ্জরের

মধ্যে থাকে আমাদের **ফুস্‌ফুস্‌**। ফুস্‌ফুস্‌টি দুটি অংশে বিভক্ত। দুটো অংশ থেকে দুটো নল বেরিয়ে অপর একটি বড় নলে এসে যুক্ত হয়েছে। ঐ বড় নলটিকে বলে **শ্বাসনালী**। ফুস্‌ফুসে আছে অসংখ্য ছোটো ছোটো থলের মত **বায়ুকোষ**। এই বায়ুকোষের গায়ে অনেক সরু সরু রক্তবহা নল থাকে। এইখানেই রক্তের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের মিলন হয়। আর এইখানেই রক্ত থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও কিছুটা জলীয় বাষ্প ফুস্‌ফুসের মধ্যেকার অবশিষ্ট বায়ুতে মিশে যায় এবং নিঃশ্বাস বায়ুর সাথে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়।



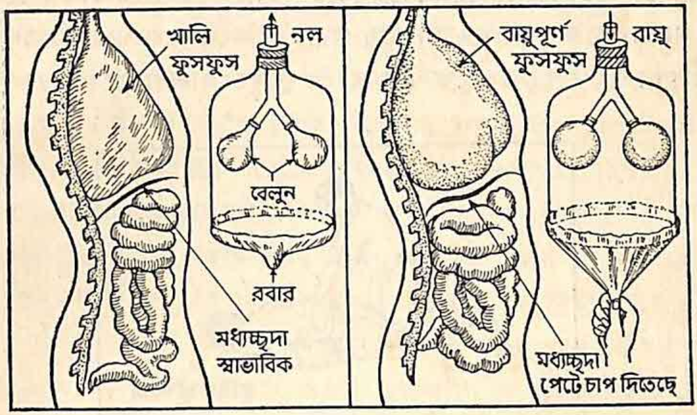
শ্বাসগ্রহণের সময়ে পাঁজরার হাড়গুলি একটু উপরের দিকে এগিয়ে যায়। মধ্যচ্ছদাও সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত হয়ে নিচের দিকে নেমে যায়। তার ফলে বক্ষ-পিঞ্জরের আয়তন বেড়ে যায়। বক্ষ-পিঞ্জরের আয়তন বেড়ে যাওয়ার ফলে ফুস্‌ফুসের মধ্যেকার বায়ুর চাপ ক'মে যায়। তখন বাইরের ও ভিতরের বায়ুর চাপের সমতা রক্ষার জন্য বাইরের বায়ু নাকের ছিদ্রপথে শ্বাসনালী দিয়ে ফুস্‌ফুসে ঢুকে পড়ে। বায়ু ফুস্‌ফুসে ঢুকে পড়া মাত্র ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষ ও রক্তবহা নালীর মধ্যস্থতায় অক্সিজেন (অম্লজান) ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের (অঙ্গারাম্লের) মধ্যে আদান-প্রদান চলে।

পেশীমাত্রই সঙ্কোচনের পরে প্রসারিত হতে চায়। নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ে তাই মধ্যচ্ছদা ও পাঁজরার পেশীগুলি প্রসারিত হয়। এই প্রসারণের জন্য বক্ষগহ্বরের আয়তন কমে যায়। ফলে ফুস্‌ফুসের মধ্যেকার বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। তখন বাইরের ও ভিতরের বায়ুচাপের সমতা রাখার জন্য অঙ্গারাম্ল ও জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু ফুস্‌ফুস থেকে নাকের ছিদ্র পথে বাইরে বেরিয়ে আসে।

ফুস্‌ফুসের মধ্যে বায়ু কিভাবে প্রবেশ করে এবং কিভাবে বেরিয়ে যায় সেটি নিচের পরীক্ষার সাহায্যে বুঝতে পারা যাবে।

পরীক্ষা—চিত্রানুযায়ী একটি বেল-জার নাও। Y-আকারের একটি কাঁচ-নল নিয়ে তার দুটো বাহুর সঙ্গে দুটো ছোটো রবারের বেলুন সুতো দিয়ে আঁট করে

বাঁধা হ'ল। বেল-জারের ছোট মুখটির মাপ অনুযায়ী একটি কর্ক নিয়ে তার মধ্যে এমন একটি ছিদ্র করা হ'ল যাতে Y-আকৃতি নলটির তৃতীয় মুখটি ঢুকতে পারে। এবার কর্কটিকে ছোটো মুখে বসিয়ে দিয়ে বেল-জারের বড়ো মুখের প্রান্ত দিয়ে বেলুন



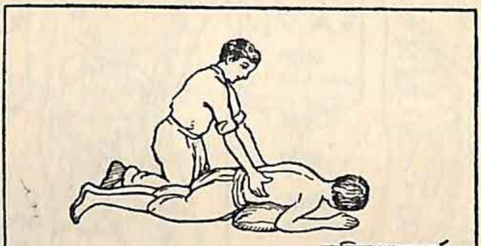
বাঁধা নলটি ঢুকিয়ে ছিপির মধ্য দিয়ে তার তৃতীয় নলটি এঁটে দেওয়া হ'ল। তারপর বেল-জারের চওড়া মুখের সঙ্গে মাপমতো একখণ্ড পাতলা রবারের টুকরো আঁট করে বাঁধা হ'ল যাতে ঐ পথে কোনো বায়ু না ঢুকতে পারে। এবার রবারের পর্দার মাঝখানটা টেনে একখণ্ড শক্ত সুতো দিয়ে বেঁধে দিলেই চিত্রানুযায়ী যন্ত্রটি তৈরি হবে।

এবার সুতো ধ'রে রবারের পর্দাটি নিচের দিকে টানলে, বেল-জারের মধ্যকার আয়তন বেড়ে যাবে অর্থাৎ ঐ স্থানের বায়ুর চাপ ক'মে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে, চাপের সমতা রক্ষার জন্য, Y-নলের খোলা মুখ দিয়ে বায়ু ঢুকে রবারের বেলুন দুটিকে ফুলিয়ে দেবে। সুতোটা ছেড়ে দিলে আবার বেলুন দুটো চুপ্‌সে যাবে। মোটামুটি এইভাবেই আমাদের ফুস্‌ফুসে বায়ু প্রবেশ করে ও বের হয়ে যায়। এখানে বেল-জারের নিচের পাতলা রবারের আচ্ছাদনটি মধ্যচ্ছদার ন্যায় কাজ করে।

জলে ডোবা ও কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া

আমাদের দেশে বহু নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা আছে। এছাড়া ভারতের তিনদিক সমুদ্র-দিয়ে ঘেরা ব'লে, সমুদ্রের ধারে ধারেও বহু লোকের

বাস। সুতরাং গভীর জলে নেমে স্নান করতে গিয়ে সাঁতার জানা বা না জানা উভয় প্রকার লোকেরই জলে ডুবে যাওয়া একটি নিত্যকার ঘটনা বললেও চলে। এই প্রকার দুর্ঘটনায় শ্বাসরোধ হয়েই লোক মারা যায়। ক'লকাতার মত বড়ো বড়ো শহরেও পুকুরে সাঁতার শিখতে গিয়ে অথবা আনন্দ ক'রে স্নান ক'রতে গিয়ে কতো না বালক ও যুবক অকালে প্রাণ হারায়। জলে ডুবে গিয়ে শ্বাসগ্রহণ করার চেষ্টায় নাক-মুখ দিয়ে জল পেটের মধ্যে ও ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রবেশ করে। ফলে



কৃত্রিম শ্বাসকার্য



কৃত্রিম শ্বাসকার্য

শ্বাসরুদ্ধ হয়েই লোক মারা পড়ে। ঐ অবস্থায় জল থেকে তুললেই তাকে মৃতের মতো দেখায়। কিন্তু অনেক সময় যদি দ্রুত জল থেকে তুলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য চালানো যায় তবে দেখা যায় লোকটি স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসকার্য চালাতে পারে ও জীবন ফিরে পায়।

বেশি সময় শ্বাসকার্য বন্ধ থাকলে জলে ডোবা ব্যক্তি মারা যায়। জলে ডোবা ব্যক্তিকে জল থেকে তুলতে পারলে সময়ের বিচার না ক'রে তৎক্ষণাৎ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে তার শ্বাসক্রিয়ার সহায়তা ক'রতে হবে। এরজন্য আমাদের প্রত্যেকের কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া পদ্ধতিটি জেনে রাখা উচিত।

জলমগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসাঃ কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া পদ্ধতি—জলমগ্ন

ব্যক্তিকে জল থেকে তুলে দ্রুত একটি খোলা জায়গায় ঘাসের উপর বা নরম কোনো বিছানার উপর শুইয়ে দিতে হবে। প্রথমে মুখ থেকে কাদা, মাটি প্রভৃতি বের ক'রে ফেলতে হবে এবং মুখ, চোখ ও সমস্ত দেহ তাড়াতাড়ি মুছিয়ে দিতে হবে। পরে দেহটিকে উপুড় ক'রে শুইয়ে দিয়ে, একটা শুকনো তোয়ালে বা কাপড় দিয়ে কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে দিতে হবে। এবার চিত্রানুযায়ী একজন রোগীর পাশে তার মাথার দিকে মুখ ক'রে বসবে। এইবার দুইটি হাতের তালু রোগীর দুইপাশে বুকের পাঁজরার উপর রেখে চাপ দিয়ে হাত দু'খানা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই ভাবে 2-3 সেকেণ্ড রেখে চাপ আল্‌গা ক'রে দিতে হবে। এই সময় যদি অপর কোনো ব্যক্তি রোগীর মুখ খুলে রেখে জিভটি টেনে মুখের বাইরে একটু একপাশে ধ'রে রাখতে পারে, তবে খুবই সুবিধা হয়। এইভাবে কিছুক্ষণ ঐ পদ্ধতি চালিয়ে গেলে দেখা যাবে রোগীর পেটের ও ফুস্‌ফুসের জল নাক-মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। জল বেরিয়ে গেলে, রোগীকে চিৎ ক'রে কাঁধের নিচে একটা বালিশ দিয়ে শুইয়ে দিতে হবে। তারপর একজন মাথার কাছে বসে রোগীর হাত দুটো ধ'রে একবার তার মাথার সমান্তরালে আনবে আর একবার গুটিয়ে রোগীর বুকের দু'পাশে চেপে ধরবে। বেশ কিছুক্ষণ প্রক্রিয়াটি চালালে রোগী ধীরে ধীরে নিজেই শ্বাসকার্য চালাতে চেষ্টা করবে। তখন তার বুকের পাঁজরের ওঠানামা লক্ষ্য রেখে শ্বাস নেবার সময় চাপ আলগা করতে হবে এবং শ্বাসত্যাগের সময় চাপ দিতে হবে।

অনেক সময় প্রায় দেড় থেকে দু'ঘণ্টা অবধি কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার পর দেখা যায় রোগী নিজে থেকে শ্বাসক্রিয়া সুরু করেছে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কৃত্রিম-শ্বাসক্রিয়া বন্ধ করা উচিত নয়।

রোগী কিছুটা স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসকার্য শুরু করলে, তার দেহ গরম কাপড়ে ঢেকে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শক্রমে তাকে গরম দুধ বা ঐ জাতীয় পানীয় দিতে হবে।

4. গৃহে বায়ু চলাচলের মূল নীতি

বায়ু আমাদের শ্বাসকার্যের অর্থাৎ জীবনধারণের সর্বপ্রধান সহায়ক। বায়ুর অক্সিজেন এই শ্বাসকার্যে আমরা ব্যবহার করি। সুতরাং বায়ুতে অক্সিজেনের অনুপাত (প্রতি 5 ভাগে 1 ভাগ অক্সিজেন) কম হ'লে, আমাদের শ্বাসকার্যে

বাধা হবে। দ্বিতীয়তঃ বায়ুমণ্ডলে জলীয়-বাষ্প ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যদি খুব বেড়ে যায় তাতেও আমরা অস্বস্তি বোধ করি। কার্বন-ডাই-অক্সাইড আমাদের শ্বাসক্রিয়ায় কোনো সাহায্য করে না বরং অতিরিক্ত মাত্রায় দেহে প্রবেশ করলে দেহের ক্ষতি হয়। আর বাতাসে যদি জলীয় বাষ্প বেশি হয় তাহ'লে আমাদের দেহ থেকে প্রয়োজনের অধিক যে জল বাষ্প হয়ে বাতাসে মিশে যায়, তা তখন ঘাম হয়ে আমাদের দেহ ভিজিয়ে দেয়। আমরা অসহ্য গরম বোধ করি। শীতকালে বাতাস থাকে শুকনো ; ফলে আমাদের লোমকূপ দিয়ে যে জল বের হয় তা আমরা টের পাবার আগেই বাষ্প হয়ে বাতাসে মিশে যায়। কিন্তু গরমকালে বা বর্ষাকালে যখন বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে তখন অনেক সময় ঘামে আমাদের দেহ ভিজে যায়। পাখার হাওয়া ক'রে তবে আমরা সেই ঘামকে বাষ্প করে দিই।

সুতরাং বায়ু-চলাচলের মূল নীতি নির্ভর করে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর, যার সবগুলিই আমাদের শরীরের সুস্থ বোধ করা ও বাধাহীনভাবে শ্বাসকার্য করার দিকে লক্ষ্য রেখে স্থির করা হয়েছে। ঐ নীতিগুলি যথাক্রমে

(1) **বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ স্থির রাখা ;**

(2) **বায়ুতে জলীয় বাষ্প ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ স্থির রাখা।**

কোনো ছোটো ঘরে যদি অনেক লোক একসঙ্গে থাকি এবং দরজা-জানলা সব বন্ধ থাকে তবে আমরা খুবই গরম বোধ করি। এমন কি শীতের দিনেও অধিকক্ষণ এক ঘরে অনেক লোক থাকলে বেশ গরম ও অস্বস্তি বোধ হয়। গরমের দিনে আমরা যখন ক্লাসে ব'সে পড়াশুনা করি তখন যদি হঠাৎ পাখা বন্ধ হয়ে যায়, বা পাখাবিহীন ঘরে বাইরের বায়ু না ঢোকে অর্থাৎ দরজা-জানলা বন্ধ থাকে তবে ভীষণ গরম ও অসুস্থ বোধ করি। ট্রেন বা বাস চলতে চলতে যদি একস্থানে হঠাৎ থেমে যায়, তখন কামরা ভর্তি লোকের যে কী কষ্ট হয়, তা আমরা অনেকেই অনুভব করি। আবার যখন গাড়িটি চলতে থাকে তখন খোলা জানলা দিয়ে জোরে বাতাস কামরার মধ্যে ঢোকে, আর আমরা তখন আরাম বোধ করি, সুস্থ বোধ করি।

কিন্তু কেন এরূপ হয়? এর কারণ খুব সহজ। আমরা যখন প্রশ্বাসের সঙ্গে বায়ু গ্রহণ করি তখন বায়ুর অক্সিজেনের অনেকটাই আমাদের দেহের মধ্যে রক্তের

সঙ্গে মিশে কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। তার সঙ্গে মিশে থাকে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প। ফলে, একটা আবদ্ধ ঘরের মধ্যে অনেক লোক যদি অনেকক্ষণ ধ'রে শ্বাসকার্য চালায় তাহ'লে ঐ ঘরের বায়ুতে অক্সিজেনের ভাগ অনেক ক'মে যাবে, এবং ঘরের বায়ুতে তপ্ত জলীয় বাষ্পের ভাগ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভাগ বেড়ে যাবে। ঐ অবস্থায় শ্বাসকার্যে বাধা তো হবেই তাছাড়া সকলেই দৈহিক অসুস্থতা বোধ করবে।

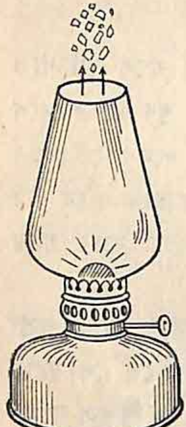
অনেক সময়ে আবদ্ধ ঘরে অনেক লোক রাত্রি কাটানোর ফলে দুর্ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে। শ্বাসরোধ হয়ে অনেক লোক মারাও গেছে। খুব শীতের দেশে ঘরের মধ্যে আগুন রাখার ব্যবস্থা না করলে শীতে দেহের রক্ত জমে যেতে চায়। ঐরূপ ক্ষেত্রে আগুনে কাঠ বা কয়লা দহনের জন্য ঘরে অক্সিজেনের ভাগ ক'মে যায় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভাগ বেড়ে যায়। সুতরাং ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত লোকগুলি শ্বাসরোধ হয়ে মারা পড়ে।

ঘরে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা রাখলে ঘরের দূষিত বায়ু অর্থাৎ অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও স্বল্প অক্সিজেনপূর্ণ উষ্ণ বায়ু বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে আর তার স্থান দখল করে বাইরের বিশুদ্ধ শীতল বায়ু, যাতে অক্সিজেনের ভাগ বেশি থাকে।

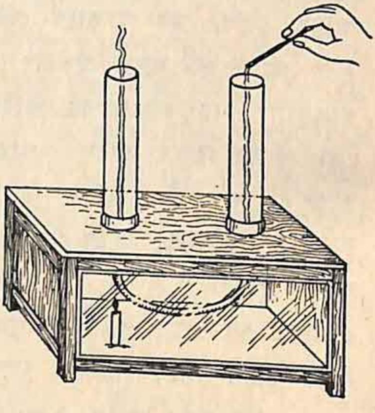
(ক) উষ্ণ বায়ুর উপরে ওঠা ও শীতল বায়ুর নিচে নামা— আমরা দেখি, মেঘ আকাশে ভেসে বেড়ায়। জলীয় বাষ্প কিছুটা ঘনীভূত হ'য়ে মেঘের সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি, মেঘ বায়ু থেকে অবশ্যই হালকা। কারণ হালকা বস্তু ভারি বস্তুর উপর ভেসে থাকতে পারে। কেরোসিন তেল জলের উপরে ভাসে। পারদ এত ভারি যে লোহাও পারদের উপরে ভাসে। বায়ু উষ্ণ হ'লে তা আয়তনে বেড়ে যায়। আয়তনে বেড়ে যাওয়ায় বায়ু হালকা হ'য়ে পড়ে। সুতরাং ঐ উষ্ণ বায়ু উপরের দিকে ওঠে। আবার শীতল বায়ু ঘন এবং ভারি ব'লে নিচের দিকে নেমে আসে। যদি কোথাও খুব জোরে আগুন জ্বলতে থাকে, দেখা যায় আগুনের শিখা উপরের দিকে ওঠে। আর চারদিক থেকে বায়ু ছুটে আসে সেখানে। এর কারণ এই যে, আগুনের উত্তাপে ঐ স্থানের বায়ু উত্তপ্ত হ'য়ে আয়তনে বেড়ে যায় ও হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। ঐ স্থানটি তখন অপেক্ষাকৃত বায়ুশূন্য

হয়ে পড়ে। সুতরাং চারপাশের বায়ু শীতল ও ভারি থাকায় ঐ শূন্যস্থানের দিকে ছুটে আসে।

প্রথম পরীক্ষা—একটি সাধারণ পরীক্ষার সাহায্যে উষ্ণ বায়ুর এই ঊর্ধ্ব-গতি আমরা প্রমাণ করতে পারি। একটা চিমনি লাগানো কেরোসিনের টেবল-ল্যাম্প নেওয়া হ'ল। আলোটি জেলে টেবিলের উপর রাখা হ'ল। এবার খুব ছোটো ছোটো কতকগুলো কাগজের টুকরো চিমনির মুখ দিয়ে চিমনির ভিতরে ফেলতে চেষ্টা করলে দেখা যাবে, ভিতরের গরম হাওয়ার জোরে ঐ কাগজের টুকরোগুলি উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। চিমনির নিচে দিয়ে শীতল বায়ু ঢুকে আলোটি জ্বলতে সাহায্য করছে। আর উপর দিয়ে উষ্ণ বায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে।



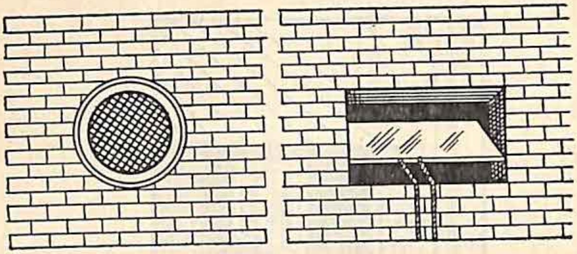
দ্বিতীয় পরীক্ষা—একটি চৌকো কাঠের বাক্স নেওয়া হ'ল, যার একদিকে কাঁচের টানা লাগানো আছে আর উপরের ডালায় দুটি ছিদ্রে দুটি কাঁচের চিমনি লাগানোর ব্যবস্থা আছে। কাঁচের টানাটি টেনে খুলে, ঐ বাক্সের মধ্যে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি একটা চিমনির ঠিক নিচের ছিদ্র বরাবর রেখে দিয়ে কাঁচের টানাটি বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। এবার দ্বিতীয় চিমনিটির বাইরের মুখের কাছে একটা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে ধরা হ'ল। দেখা যাবে ধূপের ধোঁয়া ধূপকাঠির ঠিক নিচের চিমনির মুখ দিয়ে বাক্সে ঢুকে অপর চিমনি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে ঠাণ্ডা ও ভারি বায়ু নিচেয় নেমে এল এবং দীপের আগুনে উষ্ণ হয়ে পুনরায় উপরে উঠে গেল।



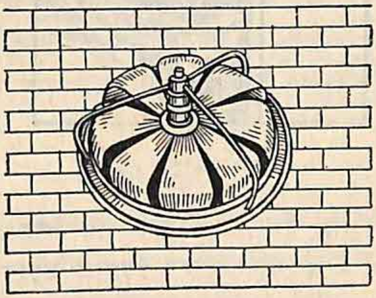
দ্বিতীয় নম্বর পরীক্ষা থেকে এটাও বোঝা গেল যে, **ঘরের মধ্যে এমন ব্যবস্থা রাখা দরকার যাতে একপথে ঠাণ্ডা ও ভারি বায়ু প্রবেশ**

করতে পারে এবং দ্বিতীয় পথে উষ্ণ ও হালকা বায়ু ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে।

(খ) থাকবার ঘরে ও রান্নাঘরে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা—থাকবার ঘরে বা রান্নাঘরে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা রাখার জন্য আজকাল নানা উপায় অবলম্বন করা হয়। ঘরে জানলা-দরজা তো বড়ো ক'রে করাই হয়, এছাড়া উপরের দিকে ছাদের কাছাকাছি দেয়ালে 'ঘুলঘুলি' রাখা হয়। ঐ 'ঘুলঘুলি' পথে উষ্ণ বায়ু ঘর

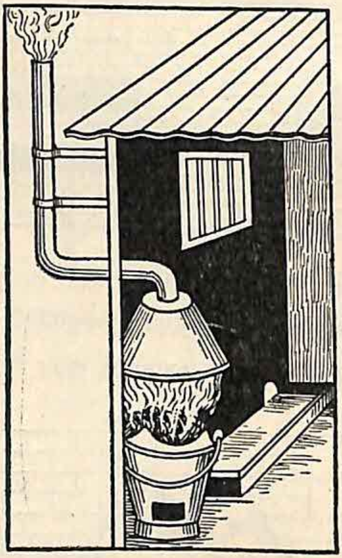


থেকে বাইরে বেরিয়ে যায় এবং জানলা ও দরজার পথে বাইরের শীতল বায়ু ঘরে প্রবেশ করে। অবশ্য পাকা বাড়ির প্রতিটি ঘরের জন্যই এই ব্যবস্থা থাকা দরকার। খড়ের ঘর বা টিনের ঘরের ছাদের কাছে এমনিতেই প্রচুর ফাঁক থাকে, যাতে ঘরের



উষ্ণ বায়ু বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। খুব বড়ো বড়ো ঘরে অর্থাৎ সিনেমা ঘরে বা সভা-ঘরে, যেখানে অনেক সময়ে দরজা-জানলা বন্ধ রেখে সিনেমা বা সভা চালাতে হয়, সেইসব ক্ষেত্রে ছাদের কাছাকাছি স্থানে একরূপ বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা থাকে। ঐ পাখাগুলি ঘরের উষ্ণ ও দূষিত বায়ু বাইরে টেনে নেয়। ফলে ঘরে নিচের দিকের দরজা-জানলার অল্প ফাঁক দিয়েও প্রচুর ঠাণ্ডা ও বিশুদ্ধ বায়ু

ঘরে ঢুকতে পারে। আবার বিপরীত দিকের দেয়ালে অনুরূপ বৈদ্যুতিক পাখা লাগিয়ে বাইরের শীতল বায়ু ঘরে ঢোকানো যায়। আজকাল পাকা বাড়িতে রান্না-ঘরের বায়ু চলাচল ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়। রান্নাঘরে দিনের অনেকটা সময় উনুন জ্বলে ; কাঠ, কয়লা, ঘুঁটে প্রভৃতি পোড়ে। তার ফলে ঘরের বায়ুতে যে শুধু অক্সিজেনের পরিমাণ ক'মে যায় তা নয়, ঘরে ধোঁয়ারও সৃষ্টি হয়। **ধোঁয়া হ'ল বায়ুতে ভেসে থাকা খুবই সূক্ষ্ম আকারের অঙ্গারকণা।**

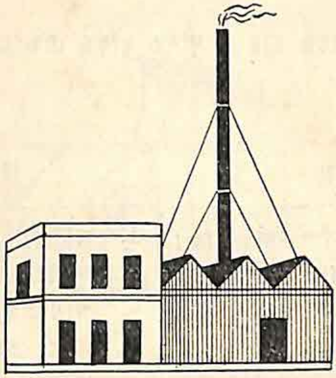


উনুনে বসানো চোঙা

ঐ ধোঁয়া ঘরের আসবাবপত্র নষ্ট তো করেই, তার উপর রান্নাঘরে যাঁরা কাজকর্ম করেন তাঁদের প্রশ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়া দেহের ভিতরে প্রবেশ ক'রে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। এইজন্য রান্নাঘরের ছাদে এমনভাবে বড়ো ক'রে ছিদ্র রাখা হয় যাতে ঘরের ধোঁয়া বা গরম বায়ু বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু বাইরের বৃষ্টির জল ভিতরে প্রবেশ ক'রতে পারে না। অনেক সময়ে উনুনের উপর বড়ো-মুখওয়ালা লম্বা চোঙ এমনভাবে বসিয়ে দেওয়া হয় যাতে তা চিমনির মতো ছাদের ছিদ্রপথে বাইরে বেরিয়ে থাকে। অবশ্যই চিমনির উপরদিকে চারপাশে বড়ো ফাঁক রেখে ঢাকনা বসিয়ে রাখা হয় যাতে ঘরের ভেতরে জল না ঢোকে। বড়ো বড়ো

কলকারখানায় যে বিরাট আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা রাখতে হয়, সেখানেও অগ্নিকুণ্ডের উপর থেকে ঐরূপ লোহার বা ইটের খুব উঁচু চিমনি বসানো থাকে যাতে কয়লার ধোঁয়া কাছাকাছি স্থানের বায়ুকে দূষিত না করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখা উচিত। অনেকেই বাড়িতে রান্নাঘরটি সব থেকে ছোটো ক'রে তৈরি করেন। কিন্তু তা কোনোমতেই উচিত



কারখানার চিমনি

নয়। এতে রান্নাঘরে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের দৈহিক অসুবিধা তো হয়ই, স্বাস্থ্যও শীঘ্রই ভেঙ্গে যায়। অল্পপরিসর রান্নাঘর যে তাঁদের স্বাস্থ্যভঙ্গের একটা প্রধান কারণ তা অনেকে ধারণাও করতে পারেন না।

(গ) মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে বায়ু চলাচলের প্রভাব—স্বাস্থ্যই মানুষের প্রধান সম্পদ। স্বাস্থ্য বলতে আমরা বুঝি নীরোগ শরীরে কর্মক্ষম থাকা। দেহ সুস্থ থাকলে, মনে স্ফূর্তি থাকে। কাজে উৎসাহ আসে, শ্রমে মানুষ কাতর হয় না। আবার অধিকাংশ মানুষকেই গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয় দিনের অধিকাংশ সময়—তা সে গৃহ তার বাসস্থানই হোক কি কর্মস্থলই হোক।

সুতরাং ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল ব্যবস্থা রাখা স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। বায়ু চলাচল ব্যবস্থার দ্বারা আমরা ঘরের দূষিত বায়ু বের করে দিই এবং বাইরের বিশুদ্ধ বায়ু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করাই। বায়ু দূষিত হয় নানা প্রকারে। অক্সিজেনের পরিমাণ খুব ক'মে যাওয়া, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ খুব বেড়ে যাওয়া, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ দেহের পক্ষে অস্বস্তিকর হওয়া, বায়ু উষ্ণ হয়ে যাওয়া এগুলি তো আছেই, এছাড়া ধুলো, ধোঁয়া, অসুস্থ লোকের নিঃশ্বাস

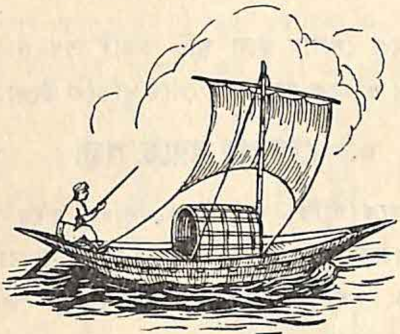
থেকে রোগবীজাণু বায়ুতে মিশে যাওয়াও বায়ু দূষিত হওয়ার কারণ। এইরূপ দূষিত বায়ু আমাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ ক'রে শুধু যে আমাদের শ্বাসকষ্ট ও দৈহিক অস্বস্তি সৃষ্টি করে তাই নয়, অধিকন্তু ধুলো, ধোঁয়া ও রোগবীজাণু দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলিকেও ক্ষয় করে ও নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি করে। সুতরাং ঘরে বায়ু-চলাচল ব্যবস্থা আমাদের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু ও দূষিত বায়ুর প্রভাব নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :—

বিশুদ্ধ বায়ু	দূষিত বায়ু
1. সহজভাবে শ্বাসকার্য করা যায়। অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে ব'লে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া চালাতে হয় না।	1. শ্বাসকার্য সহজভাবে হয় না। অক্সিজেনের অভাব হলে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া চালাতে হয় এবং তার জন্য দৈহিক ক্লান্তি আসে।
2. অক্সিজেন বেশি থাকে ব'লে দেহের মধ্যে মৃদু দহন-ক্রিয়া ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। খাদ্য-বস্তু পরিপাক হয়। দেহে প্রয়োজনীয় উত্তাপ সৃষ্টি হয়। রক্ত বিশুদ্ধ হয়।	2. অক্সিজেনের অভাব থাকে ব'লে দেহের মধ্যে খাদ্যবস্তুর দহন-ক্রিয়া ভালোভাবে সম্পন্ন হয় না। রক্ত বিশুদ্ধ হতে পারে না।
3. বিশুদ্ধ বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকাতে দেহের অপ্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্প বায়ুতে বের হয়ে যেতে পারে। ঘাম হয় না; অস্বস্তি বোধ হয় না।	3. জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকলে দেহের অপ্রয়োজনীয় জল বাষ্পাকারে বায়ুতে গিয়ে মিশতে পারে না। প্রচুর ঘাম হয়। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হয়।
4. ধুলো বা ধোঁয়ার সঙ্গে রোগবীজাণু দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। রোগ দেহকে আক্রমণ করতে পারে না।	4. ধুলো ও ধোঁয়ার সঙ্গে রোগবীজাণু অনায়াসে দেহে প্রবেশ করে। নানাপ্রকার বায়ুবাহিত রোগ—যথা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হাম, যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধি দেহকে আক্রমণ করে।

5. বায়ুর শক্তি

বায়ুর ওজন আছে। বায়ু সচল। উষ্ণতার তারতম্যে বায়ুমণ্ডলে প্রবাহ সৃষ্টি হয়। প্রবল বেগে যখন বায়ু বইতে থাকে তখন তাকে আমরা ঝড় বলি। এই ঝড়ের শক্তি আমরা অনেকেই দেখেছি। প্রবল ঝড়ে গাছপালা ভেঙ্গে পড়ে।



ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়ে যায়। অনেক সময়ে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘর-দুয়ার, গাছ-পালা ও শস্যের বিরাট ক্ষতি করে। বায়ু যখন ধীরে বইতে থাকে তখনও



তার শক্তি কম নয়। এই শক্তিকে আমরা নানা কাজে লাগাই। প্রকৃতপক্ষে কাজ করার ক্ষমতার নামই শক্তি। সুতরাং যেখানেই কোনো না কোনো প্রকার কাজ হচ্ছে, সেখানে শক্তির ক্রিয়া তার পিছনে অবশ্যই আছে। আমরা পালের

সাহায্যে ছোটো-বড়ো নৌকা চালাই। বায়ু পালে বেধে পালের সঙ্গে নৌকাকে ঠেলে নিয়ে চলে। তখন মাঝিরা শুধু হাল ধ'রে বসে থাকে নৌকাকে ঠিক পথে চালনা করার জন্য। কিন্তু বায়ু যেদিকে বইতে থাকে তার বিপরীত দিকে নৌকা চালানো খুবই কষ্টকর। তখন দাঁড় বেয়েও নৌকাকে চালিয়ে নিতে কষ্ট হয়।

আবার যখন আমরা খেলার ছলে ঘুড়ি ওড়াই তখনও ঐ বায়ুর শক্তিকে কাজে লাগাই। ঘুড়ির কাগজে বায়ু বাধা পেয়ে ঘুড়িকে ঊর্ধ্বে উঠিয়ে রাখে।

6. লোহায় মরচে পড়া

আমরা প্রায়ই দেখে থাকি, বাইরে অনেকদিন ধ'রে যদি কোনো লোহা প'ড়ে থাকে, তাতে 'মরচে' ধরে যায়। অনেক পুরানো বাড়ির জানলায় যে লোহার শিকগুলি থাকে, দেখা যায়, সেগুলো ক্ষয় পেয়ে খুব সরু-হয়ে গেছে, নয়তো একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর এও দেখা যায় যে, শিকগুলির যে অংশ কাঠের সঙ্গে যুক্ত, সেই অংশ মরচে ধ'রে ক্ষয় পায়। আমরা ঘরে যেসব লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি তা যদি ব্যবহার না ক'রে দু' একদিন বাইরে ফেলে রাখি, দেখা যাবে লোহার উপর বাদামি রংএর একপ্রকার আবরণ প'ড়ে গেছে। ঐ বাদামি রংএর আবরণই 'মরচে'।

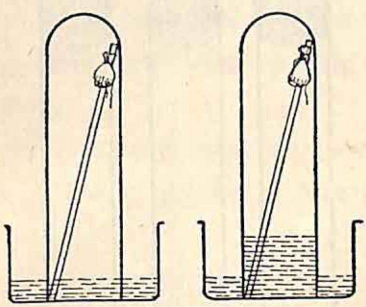
এখন আমরা দেখব 'মরচে' প্রকৃতপক্ষে কি এবং কেনই বা সৃষ্টি হয়।

মরিচা বা মরচে হ'ল লোহা ও অক্সিজেনের এক যৌগিক পদার্থ। এই যৌগে লোহা বা অক্সিজেন এদের উভয়েরই ধর্ম লোপ পেয়ে এক নতুন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ তৈরি হয় যাকে রসায়নের ভাষায় বলা হয় 'লোহার অক্সাইড'। বাংলায় আমরা বলি 'মরিচা'।

এবার দু' একটা পরীক্ষা ক'রলে আমরা বুঝতে পারব লোহায় মরচে পড়ার জন্য প্রকৃতপক্ষে কি কি প্রয়োজন।

প্রথম পরীক্ষা—কয়েকটি পরিষ্কার ছোট ছোট লোহার পেরেক নিয়ে একটি পাতলা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরোয় বাঁধা হ'ল। ঐ লোহার পুঁটুলীটা প্রায় 20 সেঃ মিঃ লম্বা একটা কাঠির মাথায় বেঁধে জলে ভিজিয়ে নেওয়া হ'ল। এবার প্রায় 25 সেঃ মিঃ লম্বা একটা গ্যাস-জার বা কাঁচের বোতল নিয়ে ওটিকে একটি জলের পাত্রের মধ্যে উপুড় ক'রে বসিয়ে দিয়ে, ঐ বোতলের ভিতরে

লোহার পুঁটুলী বাঁধা কাঠিটা ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল। বোতলের ভিতরে যেখানে জলের সীমা, ঐ সীমাতে (বোতলের বাইরের দিকে) একটি চিহ্ন দিয়ে রাখা হ'ল। কয়েকদিন ঐ ভাবে রেখে দিলে দেখা যাবে যে, বোতলের ভিতরের জলতল উপরে উঠে গেছে। এইবার বোতলটার মুখে হাত চাপা দিয়ে বাইরে এনে তার ভিতর একটি জলন্ত পাটকাঠি ঢুকিয়ে দেওয়ামাত্রই নিভে যাবে। একটা খালি বোতলের মধ্যে পাটকাঠি অত তাড়াতাড়ি নিভে যায় না। এখানে তাড়াতাড়ি নিভে যাওয়ার কারণ এই যে, ঐ বোতলের মধ্যে অক্সিজেন



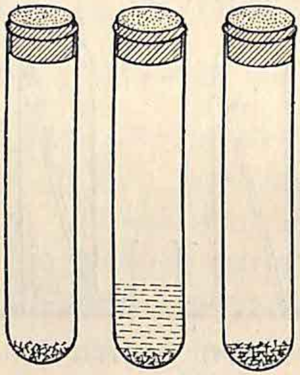
প্রথম অবস্থা দ্বিতীয় অবস্থা

একেবারেই নেই অথবা খুবই ক'মে গেছে। পুঁটুলিটা খুলে দেখা যাবে পরিষ্কার লোহাগুলির উপর বাদামি রংএর আবরণ পড়ে গেছে। লোহার গায়ে আঙ্গুল লাগালে ঐ রংটি আঙ্গুলে লেগে যায়। এর থেকে বোঝা গেল যে, লোহা বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে লোহার অক্সাইড বা মরচে সৃষ্টি করে। অর্থাৎ **মরচে উৎপাদনে বায়ুর অক্সিজেন ব্যয়িত হয়।**

দ্বিতীয় পরীক্ষা—তিনটি শক্ত কাঁচের পরীক্ষা-নল নেওয়া হ'ল। এদের প্রথমটির মধ্যে কয়েকটি চক্‌চকে পেরেক রেখে, স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন দীপে উত্তপ্ত করা হবে। তাপের ফলে পরীক্ষা-নলের ভিতরকার বায়ু শুষ্ক অর্থাৎ জলীয় বাষ্প-হীন হবে। পেরেক শুদ্ধ ঐ কর্কটির মুখে একটি ছিপি এঁটে বসিয়ে দিতে হবে।

দ্বিতীয়টির মধ্যে কয়েকটি পরিষ্কার পেরেক রেখে জল ঢেলে দেওয়া হবে, যাতে পেরেকগুলি জলের মধ্যে ডুবে থাকে। এইবার জলটি একটু বুনসেন দীপশিখায় (বা স্পিরিট ল্যাম্পের শিখায়) ফুটিয়ে নেওয়া হ'ল। দেখা যাবে জলের দ্রবীভূত বায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে। এইবার ঐ নলের মুখও ছিপিবন্ধ ক'রে রাখা হবে।

তৃতীয় পরীক্ষা-নলটিতে সামান্য একটু জল নিয়ে তার মধ্যে কয়েকটি চক্‌চকে পেরেক রেখে তার মুখটাও ছিপি বন্ধ ক'রে দিতে হবে। ছ'একদিন ঐ ভাবে রেখে তারপর তিনটি পরীক্ষা-নলের লোহাগুলির অবস্থা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষা-নলের লোহাগুলি পরিষ্কারই আছে ; কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু তৃতীয় পরীক্ষা-নলের লোহাগুলিতে যেন বাদামি রং লেগেছে অর্থাৎ মরচে পড়েছে।



প্রথম পরীক্ষা-নলে বায়ু ছিল, কিন্তু জলীয় বাষ্প ছিল না। দ্বিতীয় পরীক্ষা-নলে বায়ুহীন জলে লোহাগুলি ডোবানো ছিল। অর্থাৎ লোহাগুলি জল পেয়েছে কিন্তু অক্সিজেন পায় নি। কিন্তু তৃতীয় পরীক্ষা-নলের লোহাগুলি জল ও অক্সিজেন উভয়ই পেয়েছে এবং তৃতীয় পরীক্ষা-নলের লোহায় মরচে ধরেছে।

এর থেকে প্রমাণ হ'ল যে, **লোহায় মরচে ধরার জন্য অক্সিজেন ও জল উভয়ই প্রয়োজন।**

এইবার আমরা বুঝতে পারি, জানলার শিকের যে অংশ কাঠের সঙ্গে লেগে থাকে ঐ অংশই কেন মরচে ধরে ক্ষয় পায়। লোহার শিকের অন্য অংশের জল শুকিয়ে যায় দ্রুত কিন্তু জলে বা বৃষ্টিতে ভেজা কাঠ অধিকক্ষণ জল ধ'রে রাখে ব'লে ঐ অংশের লোহায় মরচে পড়ার সুবিধা হয়।

লোহায় মরচে ধরার জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রয়োজন। একটি পরীক্ষা-নলের মধ্যে জলের সঙ্গে কিছু কষ্টিক পটাশ মিশিয়ে নেওয়া হ'ল। ঐ

পরীক্ষা-নলের মুখে একটি কর্ক লাগিয়ে তার ভেতর দিয়ে একটি চক্‌চকে বড়ো লোহা ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল। ঐ লোহার কিছু অংশ কর্কের বাইরে থাকবে এবং কিছুটা কর্কের ভিতর দিয়ে নলের মধ্যে ঢুকে থাকবে। কয়েকদিন পর দেখা যাবে কর্কের বাইরে লোহার যে অংশ তাতে মরচে ধরেছে। কিন্তু পরীক্ষা-নলের ভিতরে লোহার অংশটিতে মরচে ধরেনি। পরীক্ষা-নলের ভিতর জল, বায়ু দুইই ছিল; কিন্তু বায়ুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড কষ্টিক পটাশ শোষণ ক'রে নেওয়ার জন্য, সেখানে কোনো কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছিল না। অথচ বাইরের বায়ুতে জল, অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড এই তিনটিই ছিল ব'লে মরচে ধরেছে। সুতরাং বোঝা গেল যে **মরচে ধরার জন্য জল ও বায়ু ছাড়া কার্বন-ডাই-অক্সাইডেরও প্রয়োজন।**

লোহার পদার্থে তেল রং দেওয়ার কারণ এই যে জল বা জলীয় বাষ্প ঐ তেল রংয়ের মধ্য দিয়ে লোহার সংস্পর্শে আসতে পারে না। সুতরাং লোহায় মরচে ধরতে পারে না।

7. দহন

কাঠ ও কয়লা পোড়াবার সময়ে তাপের সৃষ্টি হয়, কখনও কখনও আলোর শিখাও দেখা যায়। তেলের প্রদীপ, স্পিরিট ল্যাম্প, বুন্‌সেন-দীপ, মোমবাতি জ্বালালে আমরা তাপ ও আলো দুইই পাই। একেই আমরা সাধারণভাবে দহন বলি। এই দহনের ফলে বস্তুর পরিবর্তন হয়। কঠিন বস্তুর কিছুটা অংশ

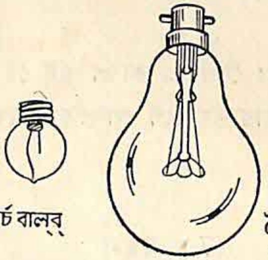


জ্বলন্ত কাঠ মোমবাতি বুনসেন দীপ স্পিরিট ল্যাম্প

কঠিন আকারে প'ড়ে থাকে, কিছু বা বাষ্প হয়ে উবে যায় অর্থাৎ বায়ুতে মিশে যায়। তরল বা গ্যাসীয় বস্তুর সবটাই প্রায় গ্যাসে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে

যায়। **যে বস্তুটি দহনের ফলে তাপ ও আলো পাওয়া যায় তাকে আমরা বলি দাহ্যবস্তু।**

আবার তাপ ও আলোক আমরা বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্ থেকেও পাই। ঐ বাল্‌বের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম তার উজ্জ্বল হয়ে আলো ও তাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু আলো নিভিয়ে দেখি ভিতরের তারটি যেমন ছিল তেমনিই আছে, কোনই পরিবর্তন হয়নি। টর্চ-লাইটের বাল্‌ব্ আমরা সকলেই দেখেছি। সেই বাল্‌বের ভিতরের ছোটো তারও ব্যাটারির শক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে আলো ও তাপ দেয়। অথচ তারটির কোনো পরিবর্তন হয় না।



দু'ধরনেই আমরা তাপ ও আলোক পাই। কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে অর্থাৎ **বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্ বা টর্চ-লাইটের বাল্‌বের ক্ষেত্রে দহন-কার্য হয় না। তার প্রধান কারণ ঐ ক্ষেত্রে উত্তপ্ত বস্তুর কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না।**

দহন-কার্যের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করি। **সবসময়ই বায়ুর অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় দহন-কার্যে।** উনুনে আগুন ভালো ক'রে না জললে আমরা পাখা দিয়ে হাওয়া করি। মোমবাতিকে বেল-জার দিয়ে ঢেকে দিলে মোমবাতি নিভে যায়, তাও দেখেছি। কিন্তু ঐ যে বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্ বা টর্চ-লাইটের বাল্‌ব্—ওটার মধ্যে বায়ু থাকে না—কোনোরূপ বায়ু ঢুকলেই তারটি পুড়ে যায়, বাল্‌ব্ নষ্ট হয়ে যায়।

আমরা অভিজ্ঞতা থেকে এটা বুঝতে পারি যে দহন-কার্যের জন্য বায়ুর অক্সিজেন একান্তই দরকার। দহনের ফলে দাহ্যবস্তুর সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়—যাকে আমরা বলি রাসায়নিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনে দাহ্যবস্তুর অক্সাইড তৈরি হয়।

অঙ্গার দহনে—কার্বন-ডাই-অক্সাইড, গন্ধক বা সাল্‌ফার দহনে সাল্‌ফার-ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়। অবশ্য সর্বপ্রকার দহন-কার্যেই যে দাহ্যবস্তু অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হবে, এমন নয়। অক্সিজেন ছাড়াও কোনো কোনো দাহ্যবস্তু তাপ ও আলোর সৃষ্টি ক'রে রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। হাইড্রোজেন নামক গ্যাস ক্লোরিন নামক গ্যাসের মধ্যে জ্বলে এবং তাপ ও আলো সৃষ্টি করে। এটিও দহন-কার্য। এই দহনের ফলে এখানে তৈরি হয় হাইড্রোজেন-ক্লোরাইড গ্যাস।

সুতরাং **যদি কোনো রাসায়নিক মিলনের ফলে তাপ ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলোক উৎপন্ন হয় তা'হলে সেই রাসায়নিক মিলনকে আমরা দহন বলি।**

এ পর্যন্ত আমরা যেসব আলোচনা করেছি তাতে বুঝেছি যে, প্রতিটি দহন-ক্রিয়াতে দুটি বিভিন্ন পদার্থ অংশ গ্রহণ ক'রে থাকে। সাধারণতঃ ঐ দুটি পদার্থের যেটি প্রত্যক্ষভাবে জ্ব'লে আলোক বা তাপ বা উভয়ই উৎপন্ন করে, তাকে আমরা বলি দাহ্যবস্তু, আর যে পদার্থটির পরিবেশে বা আবহাওয়ায় দহন-ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয়, তাকে বলি দহন-সহায়ক বস্তু। নিচে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

দাহ্যবস্তু	দহন-সহায়ক বস্তু
1. কাঠ বা কয়লা	বায়ুর অক্সিজেন
2. হাইড্রোজেন	ক্লোরিন গ্যাস
3. হাইড্রোজেন	অক্সিজেন
4. গন্ধক	বায়ুর অক্সিজেন
5. ম্যাগনেসিয়াম তার	বায়ুর অক্সিজেন
6. লোহা	বায়ু (জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে)
7. দেহের রক্ত	বায়ুর অক্সিজেন

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দাহ্যবস্তু ও দহন-সহায়ক বস্তুর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। পরিবেশ পরিবর্তন করলে দহন-সহায়ক পদার্থটিই দাহ্যবস্তুতে পরিণত হ'তে পারে।

দহন ও মরচের তুলনা

দহন-ক্রিয়াতে দাহ্যবস্তু বায়ুর অক্সিজেন (অম্লজান) এর সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ নূতন বস্তু উৎপন্ন করে। আবার লোহা জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ নূতন বস্তু—মরচে উৎপন্ন করে। সুতরাং মরচে পড়া ও

দহন-ক্রিয়া মূলতঃ একই কার্য। তবে এদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দহন-ক্রিয়ার রাসায়নিক সংযোগ খুব দ্রুত হয় এবং তার ফলে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়। কিন্তু মরচে পড়ার সময়ে ঐ রাসায়নিক সংযোগ খুব ধীরে ধীরে ঘটে। সামান্য যেটুকু তাপ সৃষ্টি হয় তা চারিদিকে সঞ্চালিত হয়ে যায় এবং আলোক সৃষ্টি করতে পারে না। অতএব **মরচে-পড়াকে মৃদু দহন বলা হয়।**

দহন	মরচে পড়া
1. দহনের সময় দাহ্যবস্তুর সঙ্গে অক্সিজেনের বা অন্য কোনো পদার্থের রাসায়নিক মিলন হয় এবং বিভিন্ন প্রকার যৌগ পদার্থের সৃষ্টি হয়ঃ অঙ্গার + অম্লজান = অঙ্গারাম্ল ; গন্ধক + অম্লজান = গন্ধকাম্ল ; হাইড্রোজেন + ক্লোরিন = হাইড্রোজেন ক্লোরাইড।	1. সবক্ষেত্রেই লোহার সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন হয় ও লোহার অক্সাইড উৎপন্ন হয়ঃ লোহা + অম্লজান = লোহার অক্সাইড।
2. দহনের কালে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হয়। যথা—মোমবাতির দহন।	2. জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি ছাড়া লোহায় মরচে ধরে না।
3. দহন-ক্রিয়ায় রাসায়নিক সংযোগ খুব দ্রুত হয়, ফলে তাপের সৃষ্টি তো হয়ই, কখনও কখনও আলোকও সৃষ্টি হয়।	3. মরচে ধরার সময় লোহার সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন এত ধীরে ধীরে হয় যে সামান্য তাপের সৃষ্টি বোঝা যায় না। আলোও কখনো হয় না। এ এক প্রকার মৃদু দহন।
4. দহনের সময়ে সাধারণতঃ অগ্নিসংযোগের প্রয়োজন হয়।	4. মরচে-সৃষ্টির ক্ষেত্রে অগ্নিসংযোগের কোনই প্রয়োজন হয় না।

দহন ও শ্বাসকার্যের তুলনা

দহন ও মরচের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, সেইরূপ দহন ও শ্বাসকার্যের মধ্যেও তুলনামূলক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

শ্বাসকার্য	দহনকার্য
1. অক্সিজেন প্রয়োজন।	1. অক্সিজেন প্রয়োজন।
2. জীব প্রশ্বাসের সঙ্গে যে অম্লজান (অক্সিজেন) গ্রহণ করে তা দেহের ভিতরের খাদ্যবস্তুর সঙ্গে রাসায়নিকভাবে মিলিত হয়।	2. দহনের সময় দাহ্যবস্তুর সঙ্গে সাধারণতঃ অম্লজান রাসায়নিক-ভাবে মিলিত হয়।
3. শ্বাসকার্যের ফলে তাপ সৃষ্টি হয় ও অঙ্গারাম্ল তৈরি হয়।	3. দহনের ফলে আলো ও তাপ সৃষ্টি হয় এবং বিবিধ গ্যাস ও অক্সাইড সৃষ্টি হয়; সুতরাং অঙ্গারাম্লও সৃষ্টি হয়।
4. একে মৃদু-দহন বলা যায়।	4. একে দ্রুত-দহন বলা যায়।
5. শ্বাসকার্যে কখনও অগ্নিসংযোগ দরকার হয় না।	5. দহনকার্যে সাধারণ ক্ষেত্রে অগ্নি-সংযোগ দরকার হয়।

প্রশ্নাবলী

1. আয়তন হিসাবে বায়ুর অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ নির্ণয়ের দুটি পরীক্ষা প্রণালী বর্ণনা কর।
2. পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর :—
   (ক) বায়ুতে জলীয় বাষ্প আছে।
   (খ) বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আছে।
   (গ) লোহার মরচে পড়ার জন্য অক্সিজেন ও জল উভয়ই প্রয়োজন।
3. বায়ু চলাচলের সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক কি তা আলোচনা কর।
4. পাকা বাড়িতে শয়নঘরে ও রান্নাঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা কিভাবে করবে বর্ণনা কর।

5. 'বায়ুর ওজন আছে'—প্রমাণ কর।
6. দহন ও মরচে পড়ার তুলনা কর।
7. দাহ্য ও দাহক কাকে বলে? কয়েকটি উদাহরণ দাও।
8. মাছেরা কি বিভিন্ন উপায়ে শ্বাসকার্য করে?
9. পরীক্ষা সাহায্যে প্রমাণ কর যে জীব শ্বাসক্রিয়ার সময় অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প ত্যাগ করে।
10. জলে ডোবা ব্যক্তির কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য প্রণালী বর্ণনা কর।
11. উদাহরণ সাহায্যে বায়ুর শক্তির ক্রিয়া বোঝাও।
12. দহন যে প্রকৃতপক্ষে রাসায়নিক পরিবর্তন তা উদাহরণ সাহায্যে আলোচনা কর।
13. 'বায়ু চাপ দেয়'—পরীক্ষা সাহায্যে প্রমাণ কর।

অনুশীলনী

1. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) বায়ুর এক-পঞ্চমাংশ——এবং চারি-পঞ্চমাংশ——
(খ) চুনের জলের উপর সর পড়ে বায়ুতে অবস্থিত——এর জন্য।
(গ) বায়ুর চাপ দেওয়ার শক্তি আছে যেহেতু বায়ুর——আছে।
(ঘ) বায়ুমণ্ডলে তাপের তারতম্যের ফলে বায়ুমণ্ডলে——সৃষ্টি হয়।
(ঙ) মাছ——সাহায্যে জলে দ্রবীভূত বায়ু গ্রহণ করে।
(চ) আমাদের নিঃশ্বাসবায়ুতে বেশি থাকে——।
(ছ) ধোঁয়া হল বায়ুতে সূক্ষ্ম আকারে ভেসে থাকা——কণা।
(জ) দহন একপ্রকার——পরিবর্তন।
(ঝ) মরচে হ'ল লোহা ও——যৌগিক পদার্থ।
(ঞ) বায়ুর উপাদান প্রধানতঃ দুইটি — ও —।
(ট) যাবতীয় জড় বস্তুকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় একটির নাম——পদার্থ আর অপরটির নাম——পদার্থ।
(ঠ) রাসায়নিক মিলনে উপাদানগুলির নিজ নিজ — লোপ পায়।
(ড) জল — পদার্থ নয় উহা — পদার্থ।
(ঢ) — দহনকার্যে সহায়তা করে।
(ণ) চুনের জলের রাসায়নিক নাম —।

2. পার্শ্ববর্তী শব্দশ্রেণী থেকে যেটি যে প্রশ্নের সঠিক উত্তর তা প্রশ্নগুলির শূন্যস্থানে বসাও :—

(ক) বায়ুর উপাদানে আয়তন হিসাবে সব থেকে বেশি আছে— ।
(খ) শ্বাসকার্যে ও দহনকার্যে প্রয়োজন হয় বায়ুর — ।
(গ) মাছ শ্বাসকার্য করে—সাহায্যে ।
(ঘ) আমরা শ্বাসকার্য করি—সাহায্যে ।
(ঙ) পালের নৌকা চলে——তে ।
(চ) উপরের দিকে ওঠে——আর নিচে নামে—— ।
(ছ) মরচে একপ্রকার——

বায়ু-শক্তি
ফুস্‌ফুস্‌
নাইট্রোজেন
কার্বন-ডাই-অক্সাইড
ফুল্‌কা
অক্সিজেন
শীতল বায়ু
মৃদুদহন
উষ্ণবায়ু

3. নিম্নের বাক্যগুলির পাশে তিনটি ক'রে কারণ দেখানো হয়েছে। তিনটির মধ্যে যেটি সঠিক সেটি রেখে বাকী দুটি কেটে দাও।

(ক) বায়ুতে শ্বাসকার্য চলে, কারণ বায়ুতে আছে নাইট্রোজেন/জলীয় বাষ্প/অক্সিজেন ।

(খ) চুনের জলে সর পড়ে, কারণ বায়ুতে আছে অক্সিজেন/নাইট্রোজেন/অঙ্গারাম্ল ।

(গ) ঘুড়ি ওড়ানো সম্ভব হয়, কারণ ঘুড়ি খুব হাল্কা বলে/বায়ুর শক্তি আছে বলে/ঘুড়ির সাথে সুতো বাঁধা থাকে বলে ।

(ঘ) দহনকার্য সম্ভব হয়, কারণ বায়ুতে আছে অম্লজান/জলীয় বাষ্প/অঙ্গারাম্ল ।

(ঙ) বায়ু চলাচল সম্ভব হয়, বায়ুর ওজনের জন্য/তাপের তারতম্যের জন্য/বায়ুর চাপের জন্য ।

(চ) নিঃশ্বাস বায়ুতে যে গ্যাসটির আধিক্য হয় তার নাম নাইট্রোজেন/অক্সিজেন/কার্বন-ডাই-অক্সাইড ।

(ছ) শ্বাস গ্রহণের সময়, পাঁজরার হাড়গুলি উপরের দিকে উঠে যায়/নিচের দিকে নেমে যায়/সঙ্কুচিত হয় ।

(জ) গ্রীষ্মকালে আমরা বেশি অস্বস্তি বোধ করি যখন, বায়ু উষ্ণ হয়/বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি হয়/বায়ু হাল্কা হয় ।

(ঝ) জানলার শিকে রং দেওয়া হয়, প্রধানতঃ সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য/মরচে পড়া নিবারণের জন্য/আঘাত রোধ করার জন্য ।

(ঞ) ঘরে প্রচুর জানলা রাখা হয়, প্রধানতঃ বায়ু চলাচলের জন্য/সূর্যরশ্মি প্রবেশের জন্য/ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ।

4. নিম্নের বাক্যগুলির যেটি ঠিক তার পাশে T এবং যেটি ভুল তার পাশে F লেখ।

(ক) অক্সিজেন ছাড়া কোনোরূপ দহনকার্য সম্ভব নয়।

(খ) জলীয় বাষ্প ছাড়া মরচে পড়া সম্ভব নয়।

(গ) কইমাছ জল থেকে তুললে তৎক্ষণাৎ মরে না।

(ঘ) দহন ও মরচে পড়া মূলতঃ এক ধরণের ক্রিয়া নয়।

(ঙ) শ্বাসকার্য ও মরচে পড়া মূলতঃ একই ধরণের ক্রিয়া।

(চ) দূষিত বায়ুতে রোগবীজাণু থাকা সম্ভব।

(ছ) আমাদের শ্বাসকার্যে মধ্যচ্ছদার কোনো ক্রিয়া নেই।

(জ) বায়ু চলাচলের মূলনীতি নির্ভর করে বায়ুতে অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ স্থির রাখার উপর।

(ঝ) শীতল বায়ু উপরে উঠে যায় এবং উষ্ণ বায়ু নিচে নেমে আসে।

(ঞ) রাসায়নিক মিলনের ফলে তাপের পরিবর্তন অবশ্যই ঘটে।

(ট) ফুস্‌ফুস্‌ ছাড়া কোনো জীব শ্বাস গ্রহণ করতে পারে না।

(ঠ) পরিবেশ পরিবর্তন করলে দহন-সহায়ক বস্তুই দাহ্যবস্তুতে পরিণত হ'তে পারে।

(ড) সব রকম দহনের ক্ষেত্রেই অগ্নিসংযোগ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জল

পাঠক্রম ঃ জলের দ্রাব্যতাগুণের আলোচনা, অবস্থাগত পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টি-চক্র সৃষ্টি, জল বরফে পরিণত হওয়া এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। জল বিশুদ্ধিকরণের বিভিন্ন প্রণালী আলোচনা—যথা, আস্রাবণ, পরিস্রাবণ, কেলাসন ও বীজাণুমুক্তকরণ প্রভৃতি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

এই প্রসঙ্গগুলির আলোচনায়—চিনি বা লবণের দ্রবণ প্রস্তুতি। ঘোলা জল দ্বারা আস্রাবণ ও পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া দেখানো, চিনির দ্রবণ নিয়ে পাতনপ্রণালী এবং লবণ-জলের বাষ্পীভবন প্রভৃতি পরীক্ষার সাহায্য নিতে হবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে পরীক্ষা প্রণালীর মধ্যে চিনির দ্রবণের পাতন-পদ্ধতি অন্তর্ভূত হওয়ায় পাতন-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনাও পাঠক্রমের অন্তর্ভূত হয়ে পড়ে। কেলাসন পদ্ধতিও পাঠের অন্তর্ভুক্ত।

1. জলের দ্রাব্যতা

জল আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পানীয়। কিন্তু এই জল যে আমরা শুধু বিশুদ্ধ অবস্থায় পান করি তা নয়। জলের সঙ্গে অন্যান্য দ্রব্য মিশিয়ে, সেই মিশ্রণও পান করি। মিশ্রিত দ্রব্যগুলি কঠিন, তরল ও বায়বীয়—তিন প্রকার হ'তে পারে। বাড়িতে আমরা চিনি বা মিছরির সরবৎ তৈরি করি। একটি গ্লাসে জল নিয়ে তার মধ্যে দু'চার চামচ চিনি ফেলে বেশ করে নেড়ে দিই। দেখা যায়, চিনিটা প্রায় সবটাই জলের সাথে মিশে গেল। সরবৎটি পাতলা বস্ত্রের সাহায্যে ছেঁকে নিলে যে জল পাওয়া গেল তার মধ্যে চিনির কোনো অস্তিত্বই চোখে দেখা গেল না। স্বাদ নিয়ে দেখা গেল জলটি মিষ্টি স্বাদযুক্ত। এর থেকে বোঝা গেল যে জলের এমন শক্তি আছে যাতে চিনির দানাগুলিকে জল নিজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে নিতে পারে। এই ভাবে লবণ, চিনি প্রভৃতি জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে মিশে যায়।

আবার চা তৈরি করার সময় আমরা কেট্‌লীতে জল গরম করে নিয়ে, সেই গরম জলে চা-পাতা ফেলে দিই। কিছুক্ষণ পর দেখা যায় চা-পাতাগুলি জলে মেশে নি সত্য, কিন্তু একপ্রকার বাদামী রংএর পদার্থ চা-পাতার ভিতর থেকে

জলে এসে মিশে গেছে। জলের এমনই শক্তি যে তা চা-পাতার মধ্য থেকেও একটি পদার্থ নিজের মধ্যে মিশিয়ে নিয়েছে।

সোডা-ওয়াটারের বোতল খুললে তার ভিতর থেকে গ্যাস বেরিয়ে আসে। ঐ গ্যাসটি অঙ্গারাম্ল বা কার্বন-ডাই-অক্সাইড। খুব চাপে ঐ কার্বন-ডাই-অক্সাইড জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। আবার জলে মিশে থাকা অক্সিজেন নিয়ে মাছেরা জীবন ধারণ করে—এ তো আমাদের জানাই আছে।

উপরের উদাহরণগুলি থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে, **জলের এমন একটি শক্তি আছে যাতে জল কোনো কোনো পদার্থকে নিজের মধ্যে মিলিয়ে নিতে পারে। জলের এই ক্ষমতার নামই হ'ল জলের দ্রাব্যতা।**

কোনো পদার্থ যদি 'জলের' সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যায় যাতে মিশ্রিত পদার্থটিকে ছেঁকে পৃথক করা যায় না এবং খালি চোখে বা তীব্র আলো ফেলেও তার অস্তিত্ব ধরা যায় না, তাহ'লে সেই মিশ্রণকে বলা হয় **জলীয় দ্রবণ।** যে পদার্থটি জলে দ্রবীভূত হয় তাকে বলে **দ্রাব,** জলকে বলা হয় **দ্রাবক** এবং উৎপন্ন মিশ্রণকে বলা হয় **দ্রবণ।**

দ্রাবক + দ্রাব = দ্রবণ।

কিন্তু সব বস্তুই জলের সঙ্গে এভাবে মেশে না। চা-পাতা জলের সঙ্গে মেশে না। বালি, মাটি বা চা-খড়ি জলের সঙ্গে মেশে না।

আরও একটা জিনিস পরীক্ষা ক'রে দেখা যায় যে জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে জল অধিক দ্রাব গ্রহণ করতে পারে।

প্রথম পরীক্ষা—একটি বীকারে কিছুটা জল নিয়ে তাতে একটু একটু ক'রে চিনি মেশাতে হবে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে, চিনি আর জলে গলছে না, জলের তলায় পড়ে থাকল। ঐ পাত্রটিকে বুনসেন দীপ বা স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে তাপ দিলে দেখা যাবে পাত্রের মধ্যে যে চিনি পড়ে ছিল তা জলে মিশে গেল। শুধু তাই নয় এখন আরও দু'চার চামচ চিনিও জলে মিশে যাবে।

এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত ক'রতে পারি যে, **উষ্ণতা বাড়ালে জলের দ্রাব্যতা বাড়ে।** এর কারণ এই যে উষ্ণতা বাড়ালে জলের আয়তন বাড়ে তাই অধিকতর চিনির দানা জলের ভিতরে মিশে যেতে পারে।

দ্বিতীয় পরীক্ষা—একটি পাত্রে জলের মধ্যে লবণ ফেলে দিলেও দেখা যাবে, লবণ গলে যাচ্ছে। চামচ দিয়ে নেড়ে নেড়ে অনেকটা লবণ মিশিয়ে দেওয়া যাবে। তারপর যখন আর লবণ মিশবে না, পাত্রের তলে সামান্য পড়ে থাকবে, তখন যদি পাত্রের জলকে গরম করা হয় তাহলে আরও অধিক লবণ ঐ পাত্রের জলে দ্রবীভূত হবে।

আবার যদি ঐ অতিরিক্ত লবণ-মেশা জলটাকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া যায় দেখা যাবে, জলের তাপ কমে যাওয়াতে, দ্রবীভূত অতিরিক্ত লবণ পাত্রের তলায় দানার আকারে পড়ে আছে।

তাহ'লে আমরা একথা বলতে পারি যে **উষ্ণতা বাড়ালে জলের দ্রাব্যতা বাড়ে** এবং **উষ্ণতা কমালে জলের দ্রাব্যতা কমে।**

2. জলের বাষ্পীভবন, ঘনীভবন (তরল হওয়া), কঠিনীভবন এবং বৃষ্টিচক্র

বাষ্পীভবন—আমরা জানি, তাপ দিলে জল বাষ্প হয়ে যায়। সূর্য-তাপে সমুদ্র, নদী ও নানাপ্রকার জলাশয়ের জল বাষ্প হ'য়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। কিন্তু তাপ না দিলেও অথবা যে কোনো তাপেই জল বাষ্প হয়ে যেতে পারে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা যে কোনো সময়, দিনে বা রাতে ভিজে কাপড় ঘরের মধ্যে মেলা থাকলেও তা শুকিয়ে যায়। অর্থাৎ কাপড়ের জল বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। অথচ এই তিন ঋতুতে আমাদের দেশে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা একই রূপ থাকে না। এক খানা কাঁচ-পাত্র বা আয়নার উপর ছ'চার ফোঁটা জল ফেলে রাখলে দেখা যাবে, ঐ জল কিছুক্ষণ পরে উবে গেছে। কাঁচ জল শোষণ করতে পারে না। তাহ'লে নিশ্চয়ই ঐ জল বাষ্প হয়ে বায়ুতে মিশেছে। বায়ুমণ্ডলে সব সময় জলীয় বাষ্প রয়েছে। তার কারণ এই যে যে-কোনো উষ্ণতায়ই জল বাষ্প হয়ে যায়। **যে প্রণালীতে জল বাষ্প হয়ে যায়, সেই প্রণালীকে জলের বাষ্পীভবন বলে।**

বাষ্প হওয়া কিসের উপর নির্ভর করে ?

একটি পাত্রে জল রেখে দিলে ধীরে ধীরে সেই জল বাষ্প হয়ে যায় বটে কিন্তু পাত্রটিতে তাপ দিলে জল দ্রুত বাষ্প হয়ে যাবে। আবার বায়ুর চাপ কমালেও জল

দ্রুত বাষ্প হয়ে যায়। ঘরের মধ্যে কাপড় মেলে দিয়ে যদি পাখা চালানো যায় তবে কাপড় দ্রুত শুকোয়। পাখা চালালে ভিজে কাপড়ের উপরের বায়ুর চাপ কমে যায়। আবার বায়ুতে জলীয় বাষ্প কম থাকলেও জল দ্রুত বাষ্প হয়ে যায়। বর্ষাকালে আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টি হয় ব'লে বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকে বেশি, শীতকালে বায়ু থাকে শুষ্ক। সেইজন্য বর্ষাকাল অপেক্ষা শীতকালে আমাদের কাপড় দ্রুত শুকোয়।

সুতরাং আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে **জলের বাষ্পীভবন নির্ভর করে তিনটি জিনিসের উপর**—যথা (1) **উষ্ণতা**, (2) **বায়ুর চাপ**, (3) **বায়ুর আর্দ্রতা**। অর্থাৎ উষ্ণতা বাড়ালে বাষ্পীভবন দ্রুত হয়; বায়ুর চাপ কমালে—বাষ্পীভবন দ্রুত হয়, এবং বায়ুর আর্দ্রতা কম থাকলে বাষ্পীভবন দ্রুত হয়।

ঘনীভবন—জলীয় বাষ্পকে ঠাণ্ডা করলে তাপ হারিয়ে বাষ্প তরল জলে পরিণত হয়। এইভাবে তাপ হারিয়ে অর্থাৎ ঠাণ্ডা হয়ে বাষ্পের তরলে পরিণত হওয়াকে বলে **বাষ্পের ঘনীভবন**।

জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলে মিশে ঊর্ধ্ব আকাশে উঠে যায়। কারণ জলীয় বাষ্প বায়ু থেকে হালকা। ঐ বাষ্প ঊর্ধ্ব আকাশে উঠে সেখানকার ঠাণ্ডায় কিছুটা ঘনীভূত হয়। তখন হয় মেঘের সৃষ্টি। ঐ মেঘ আরও ঠাণ্ডা হয়ে বৃষ্টিবিন্দুরূপে ভূতলে নেমে আসে।

কঠিনীভবন—জল খুব ঠাণ্ডা হয়ে জমে বরফে পরিণত হয়। অনেক সময় বৃষ্টির সাথে সাথে 'শিল' পড়তে দেখি। ঐ 'শিল' বরফ ছাড়া আর



কিছু নয়। বৃষ্টির জল বায়ুমণ্ডলে থাকতেই যদি খুব শীতল হয়ে পড়ে তবেই ঐ

ভাবে বরফের টুকরোয় বা শিলে পরিণত হয়। জলীয় বাষ্পপূর্ণ মেঘ যখন খুব উঁচু পাহাড়ের মাথায় পৌঁছোয় তখন সেখানকার শীতল বায়ুর স্পর্শে মেঘের জলীয় বাষ্প জমে তুষার কণায় পরিণত হ'য়ে পর্বতশীর্ষে আশ্রয় নেয়। সেইজন্যই উঁচু পাহাড়ের চূড়ো সবসময় বরফে ঢাকা থাকে।

বৃষ্টিচক্র—সমুদ্র, নদী, হ্রদ প্রভৃতি জলাশয় থেকে প্রতিনিয়ত জল বাষ্প হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। ঐ বাষ্প বায়ু অপেক্ষা হালকা ব'লে উর্ধ্বে উঠে যায়। উর্ধ্বে বায়ুর চাপ কম এবং বায়ু শীতল। ফলে, জলীয় বাষ্প সেখানে প্রসারিত হয় ও শীতল হয়ে পড়ে। তখন বাষ্প কিছুটা ঘনীভূত হয়ে মেঘের রূপ নেয়। ঐ মেঘ আরও শীতল হ'লে বৃষ্টির জল হ'য়ে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। ঐ বৃষ্টির জলের কিছুটা পাহাড়ের উপরে বরফ রূপে জমা হয়, কিছুটা জলাশয়ের জলে মিশে যায়, কিছুটা মাটিতে শোষিত হয়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করে। তারপর ঝরনা রূপে আবার ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে এসে নদী বা হ্রদের জলে মেশে। পাহাড়ের উপরের বরফরাশির কিছু অংশ গ্রীষ্মকালে উষ্ণতায় গ'লে জলে পরিণত হয় এবং নদীরূপে পাহাড় থেকে সমতলভূমিতে নেমে আসে। তারপর ঐ জলরাশি হ্রদে বা সাগরে গিয়ে মেশে। পুনরায় ঐ জলরাশি বাষ্পে পরিণত হয়ে উর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়।

সুতরাং জল থেকে বাষ্প, বাষ্প থেকে মেঘ এবং মেঘ থেকে জল, এইভাবে এক চক্রের স্থষ্টি নিরন্তর চলেছে ভূপৃষ্ঠের উপর। একেই আমরা বলি 'বৃষ্টিচক্র'।

এইভাবে বৃষ্টিচক্র বা জলের বিবর্তন না চললে এতদিনে পৃথিবীতে একবিন্দুও জল থাকত না। জীব-জগতের অস্তিত্বও লোপ পেয়ে যেত।

3. জলের বিশুদ্ধিকরণ

আমরা জানি জল একটি অতি উত্তম দ্রাবক। তাই জলরাশি যখন বৃষ্টিরূপে বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আসে তখন তাতে বায়ুমণ্ডলের ধূলারাশি, বায়ুতে ভাসমান জীবাণু এবং কিছু কিছু গ্যাসীয় পদার্থ দ্রবীভূত ক'রে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছোয়। তারপর ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে বা ভূত্বকের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় নানাপ্রকার লবণজাতীয় দ্রব্য তাতে মিশে যায়। জলের দ্রাব্যতা গুণের জন্য যেসব দ্রব্য জলে মিশে যায় তার মধ্যে দু'রকমের পদার্থ দেখতে পাওয়া যায়। একরকম পদার্থ যা সম্পূর্ণরূপে জলের সাথে মিশে যায় তাকে আমরা বলি **দ্রাব্য পদার্থ**। আর কতকগুলো পদার্থও জলের সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে আসে

বটে কিন্তু জলের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিশতে পারে না, অতি সূক্ষ্ম আকারে জলের মধ্যে ভেসে আসে—এগুলোকে বলা হয় **অদ্রাব্য পদার্থ**।

দ্রাব্য পদার্থ—যথা, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও নানাপ্রকারের খনিজ লবণ ইত্যাদি।

অদ্রাব্য পদার্থ—যথা, কাদা, মাটি, বালি, চা-খড়ি, অতি সূক্ষ্ম বর্ণহীন জীবাণু ইত্যাদি।

অবশ্য এই সব পদার্থের সবগুলিই যে জলকে দূষিত করে তা নয়। কতকগুলি পদার্থ জলে মিশে থাকায় আমাদের শরীরের পক্ষে উপকারই হয়।

কতকগুলি বিশেষ রকম রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে আমরা আমাদের ব্যবহারের জলকে বিশুদ্ধ করে নিই। বিশেষভাবে, পানীয় জল বিশুদ্ধ করার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। জল বিশুদ্ধ করার জন্য আমরা নিম্নলিখিত উপায়গুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাজে লাগাই। ঐগুলি যথাক্রমে—

(ক) **আস্রাবণ**, (খ) **পরিস্রাবণ**, (গ) **পাতন**, (ঘ) **কেলাসন** (ঙ) **নির্বীজন**।

আস্রাবণ

জলে অদ্রাব্য অপেক্ষাকৃত বড় দানার পদার্থগুলি এই পদ্ধতিতে জল থেকে পৃথক করা যায়।

পরীক্ষা—একটা পাত্রে খানিকটা ঘোলা জল নিয়ে রেখে দেওয়া গেল। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে, ভাসমান পদার্থগুলি থিতিয়ে জলের নিচে পাত্রটির



তলদেশে জমা হয়েছে। এবার উপর থেকে ধীরে ধীরে পরিষ্কার জলটি অন্য পাত্রে ঢেলে দেওয়া হ'ল। এইভাবে জল থেকে ভাসমান ময়লা দূর করা হ'ল।

এই প্রক্রিয়ায় শুধু জল কেন অন্য কোনো তরলে ভাসমান পদার্থগুলিকেও তরল থেকে পৃথক করা যায়।

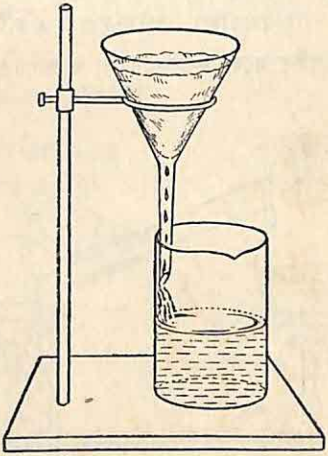
ঘোলা জলের সাথে কিছুটা ফটকিরি মিশিয়ে দিলে ভাসমান পদার্থগুলি আরও ভারি হয়ে পড়ে এবং দ্রুত জলের নিচে জমা হয়।

পরিস্রাবণ

আস্রাবণ সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম আকারে ভাসমান পদার্থগুলি পৃথক করা কষ্টকর। **পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে সব রকমের অদ্রাব্য ভাসমান পদার্থই জল থেকে পৃথক করা যায়।** এইজন্য আমরা সাধারণতঃ সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত পাতলা কাপড় বা ফিল্‌টার-কাগজ ব্যবহার করি।

পরীক্ষা—এই পরীক্ষার জন্য একটি ফানেল, ফিল্‌টার-কাগজ, একটি পরিষ্কার বীকার, একটি ময়লা জল সহ পাত্র (বীকার বা ফ্লাস্ক), একটি কাঁচদণ্ড ও একটি আংটা সমেত লোহার দণ্ড ব্যবহার করা হয়।

গোলাকার ফিল্‌টার কাগজটিকে প্রথমে দু'ভাঁজ ক'রে আবার ঐটিকে দু'ভাঁজ করা হবে। তিনটি ভাঁজ একদিকে এবং অপরটি অন্যদিকে ধরে শঙ্কুর আকারে এটি ফানেলের মধ্যে লাগিয়ে একটু জল দিলেই ফানেলের ভিতরে এঁটে বসবে। ফানেলটিকে লোহার দণ্ডে লাগানো আংটার মধ্য দিয়ে গলিয়ে তার নিচে পরিষ্কার



বীকারটি পেতে দিতে হবে। এবার ফানেলের মধ্যকার ফিল্‌টার-কাগজের সঙ্গে কাঁচদণ্ডের একটি প্রান্ত স্পর্শ করিয়ে, ঐ কাঁচদণ্ডের গা দিয়ে ধীরে ধীরে ময়লা জল ঢেলে দেওয়া হবে। পরিষ্কার জল চুইয়ে ধীরে ধীরে নিচের পাত্রে গিয়ে জমা হবে। ফানেলের নলটি নিচের বীকারের গায়ে লাগিয়ে দিলে পরিস্রুত জল দ্রুত ঐ

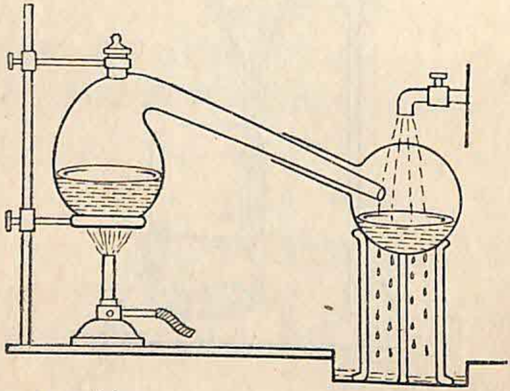
বীকারে এসে জমা হবে। ফিল্টার-কাগজের উপর পড়ে থাকবে ভাসমান ময়লাগুলি। অতি সূক্ষ্ম ময়লাগুলিও জল থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ায় পরিস্রুত জলটি খুবই স্বচ্ছ দেখাবে। এই পদ্ধতির নাম **পরিস্রাবণ**; পরিষ্কার তরলটির নাম **পরিস্রুত** (Filtrate ফিল্‌ট্রেট) এবং ফিল্টার-কাগজের উপর যে অদ্রাব্য পদার্থ জমা থাকে তার নাম **অবশেষ** (Residue, রেসিডিউ)।

পাতন

আস্রাবণ এবং পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় জলে দ্রাব্য পদার্থগুলি পৃথক করা যায় না। দ্রবীভূত পদার্থগুলি তরল থেকে পৃথক করতে হ'লে **পাতন** প্রণালীতে করা হয়।

তরলকে তাপ প্রয়োগে বাষ্পে পরিণত ক'রে পুনরায় সেই বাষ্পকে তরলে পরিণত ক'রে দূষিত পদার্থ থেকে পৃথক করাই পাতনক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তরলের **বাষ্পীভবন ও তারপর ঘনীভবনই পাতনক্রিয়ার মূলনীতি**।

পাতন-প্রণালী—(1) এই পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন একটি রিটর্ট (বক-যন্ত্র), একটি ফ্লাস্ক, একটি আংটাওয়ালা লৌহ-দণ্ড, একটি ত্রিপদী, বুনসেন দীপ বা স্পিরিট ল্যাম্প। বক-যন্ত্রটির মধ্যে লবণ-গোলা জল নেওয়া হবে। যন্ত্রটিকে একটি

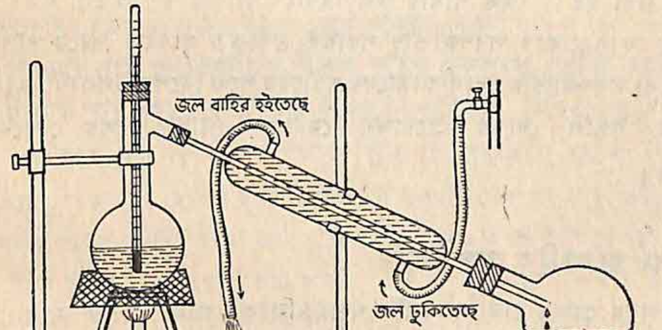


ষ্ট্যাণ্ডের সঙ্গে এমনভাবে এঁটে দিতে হবে যাতে বুনসেন দীপ দিয়ে তাকে উত্তপ্ত করা যায়। বক-যন্ত্রের লম্বা নলটি ফ্লাস্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। ঐ ফ্লাস্কটি একটি ত্রিপদীর উপর রাখা হবে। ফ্লাস্কটির উপরে ঠাণ্ডা জলের ধারা বইয়ে দেবার

ব্যবস্থা করতে হবে অথবা ব্লটিং কাগজ বা কাপড়ের টুকরো জলে ভিজিয়ে ঐ ফ্লাস্কের উপর চাপা দেওয়া হবে, যাতে শীতল জলের দ্বারা ফ্লাস্কের গাত্র সবসময় ঠাণ্ডা থাকে।

বক-যন্ত্রে তাপ দেওয়ার ফলে ভিতরের জল বাষ্পে পরিণত হয়ে লম্বা-নল মুখ দিয়ে ফ্লাস্কে ঢুকবে। ঐখানে ঠাণ্ডার সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত হয়ে বাষ্পটি পুনরায় তরলে পরিণত হবে এবং ফ্লাস্কের মধ্যে জমতে থাকবে। পরীক্ষাশেষে দেখা যাবে জলে দ্রবীভূত লবণটি বক-যন্ত্রের মধ্যে পড়ে আছে। আর সবটা জল ফ্লাস্কের মধ্যে এসে জমা হয়েছে। ঐ জলের স্বাদ নিয়ে দেখা যাবে ওটি আর লবণাক্ত নয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে যে কোনরূপ দ্রাব্য পদার্থকে জল থেকে পৃথক করা যায়। কিন্তু যে সব পদার্থ ঐ জলের বাষ্প হওয়ার তাপেই বাষ্পে পরিণত হয় অথবা তার থেকে কম তাপেই বাষ্পে পরিণত হয় সেগুলোকে জল থেকে পৃথক করা যায় না। ঐগুলি জলের সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভূত হয়ে ফ্লাস্কে এসে পৌঁছোয় এবং ঘনীভূত হয়ে সেইখানে জলের সঙ্গে থেকে যায়।

পাতন-প্রণালী—(২) বক-যন্ত্র ছাড়া, লিবিগ্-কণ্ডেন্সার নামক একপ্রকার যন্ত্র সাহায্যে বাষ্পীভূত জলকে ঘনীভূত ক'রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়।



একটি গোলতলা পাতন-ফ্লাস্কের মধ্যে তুঁতে মেশানো জল বা পটাশ-পারমাঙ্গানেট মেশানো জল অথবা চিনির দ্রবণ নেওয়া হ'ল। এর খোলা মুখে একটি কর্ক লাগানো থাকে। পাতন-ফ্লাস্কের পার্শ্ব-নলটি লিবিগ্-কণ্ডেন্সারের মধ্যকার নলের

সঙ্গে কর্ক দিয়ে লাগানো থাকবে। কণ্ডেন্সারের (শীতকের) ভিতরের নলটির বাইরে দিয়ে একটি বড় আকারের বহিরাবরণ আছে। ঐ দুই নলের ভিতর দিয়ে শীতল জল পাঠানো হবে। এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে শীতকের যে দিকটা ঢালু ঐ অংশ দিয়ে ঠাণ্ডা জল শীতকের বহিরাবরণের নিচে প্রবেশ ক'রে অন্য প্রান্ত দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। ঠাণ্ডা জলের প্রবাহটি সবসময় চালু রাখতে হয়। ঠাণ্ডা জলের প্রভাবে শীতকের ভিতরের নল দিয়ে যে বাষ্পটি বেরিয়ে আসে তা ঘনীভূত হয়ে জলে পরিণত হয়। শীতকের দ্বিতীয় প্রান্ত (ঢালু দিকের প্রান্ত) একটি ফ্লাস্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া থাকে। ফ্লাস্কটিও সুবিধামত ত্রিপদী-দণ্ডের উপর বসানো থাকে। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে পরিষ্কার স্বচ্ছ জল গ্রাহক-পাত্রে জমা হয়েছে আর পাতন-পাত্রে পড়ে আছে দ্রবীভূত বা অদ্রবীভূত পদার্থ।

এই পদ্ধতির দ্বারা দ্রবীভূত ও অদ্রবীভূত উভয় প্রকার পদার্থকে জল থেকে (বা অন্য তরল থেকে) পৃথক করা যায়। কিন্তু কোনো উদ্বায়ী পদার্থ পৃথক করা যায় না।

পাতন-পদ্ধতি দ্বারা যে জল পাওয়া যায় তা খুবই বিশুদ্ধ। এইরূপ বিশুদ্ধ জল ওষুধ প্রস্তুতের কাজে খুবই উপযোগী; রসায়নাগারে পরীক্ষাকার্যেও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পানীয় জল হিসাবে পাতিত জল ভালো নয়। কারণ এই জলে কোন প্রকার লবণজাতীয় পদার্থই দ্রবীভূত থাকতে পারে না। অথচ কতকগুলো লবণজাতীয় পদার্থ আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী এবং জলের মাধ্যমেই ঐগুলি দেহের প্রয়োজন মেটায়। পাতিত জলের কোনো স্বাদ থাকে না।

কেলাসন বা স্ফটিক প্রস্তুতকরণ

সাধারণ ভাষায় দানাদার কঠিন পদার্থগুলিকেই আমরা স্ফটিক বলি। একই পদার্থের দানাগুলির প্রত্যেকটিরই একটা বিশেষ আকৃতি থাকে। অনুবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করলে দেখা যায় দানাগুলি বিভিন্ন প্রকার জ্যামিতিক সমতল দ্বারা বেষ্টিত। যেমন ফটকিরির কেলাস বা স্ফটিক যুগ্ম-পিরামিডের আকারবিশিষ্ট। সাধারণ লবণের কেলাস ঘনক-আকৃতির।

যে প্রণালীতে কেলাস প্রস্তুত করা হয় তাকে কেলাসন বা স্ফটিকীকরণ বলে। নিম্নলিখিত উপায়ে কেলাস প্রস্তুত করা যায়।

প্রথম পরীক্ষা—একটি কাঁচপাত্রে (বীকারে) কিছুটা জল নিয়ে তাতে অল্প অল্প কপার সালফেট (তুঁতের) গুঁড়ো মেশাতে হবে। এরপর কাঁচের একটা দণ্ড দিয়ে নেড়ে দিতে হবে। নাড়তে নাড়তে এমন একটা অবস্থা আসবে যখন দেখা যাবে বীকারের জলে আর অতিরিক্ত তুঁতের গুঁড়ো মিশে যাচ্ছে না। যতটুকু গুঁড়ো জলে দেওয়া হ'ল তার সবটাই জলের নিচে পড়ে থাকল। এইবার বীকারটিতে বুন্‌সেন দীপ সাহায্যে তাপ দিতে হবে। দেখা যাবে, জল যত গরম হতে থাকবে ততই বেশি ক'রে তুঁতের গুঁড়ো জলের মধ্যে মিশে যেতে থাকবে। এইভাবে অতিরিক্ত গুঁড়ো মিশে যেতে যেতে এমন একটা অবস্থা এল যখন সামান্য একটু গুঁড়ো জলের নিচে পড়ে থাকল—জলের মধ্যে মিশে গেল না। এইবার যে দ্রবণ তৈরি হ'ল তা ঐ উচ্চ তাপমাত্রায় তুঁতের একটি 'সম্পৃক্ত-দ্রবণ' বলা যায়। কোনো এক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো দ্রাবক যতটা দ্রাব গ্রহণ করতে পারে ঠিক ততটা দ্রাব যদি দ্রবণে থাকে তবে সেই বিশেষ তাপমাত্রায় প্রস্তুত দ্রবণকে আমরা সম্পৃক্ত-দ্রবণ বলে থাকি। এখন ঐ দ্রবণটিকে পরিস্রুত ক'রে অন্য একটি বীকারে নিয়ে স্থিরভাবে রেখে দেওয়া হ'ল। দ্রবণ ধীরে ধীরে শীতল হলে দেখা যাবে তুঁতের স্ফটিক (কেলাস) তৈরি হয়ে বীকারের নীচে জমা হয়েছে। পরিস্রাবণ প্রণালীতে ঐ কেলাসগুলিকে জল থেকে আলাদা ক'রে ব্লটিং কাগজের ভাঁজে রেখে শুকিয়ে নেওয়া যায়।

এইভাবে **সম্পৃক্ত-দ্রবণকে শীতল ক'রে কেলাস তৈরি করা যায়।**

দ্বিতীয় পরীক্ষা—একটি বড় বীকারে খানিকটা চিনির লঘু-দ্রবণ নেওয়া হ'ল। এইবার বুন্‌সেন দীপের তাপ দিয়ে ঐ লঘু-দ্রবণ থেকে কিছুটা জল বাষ্পাকারে বের করে দেওয়া হ'ল। এইভাবে দ্রবণটা বেশ ঘন হয়ে এল। বীকারের গায়ে যখন সামান্য চিনির দানা জমা হচ্ছে দেখা গেল, তখন তাপ দেওয়া বন্ধ ক'রে বীকারটিকে স্থিরভাবে রেখে দেওয়া হ'ল। এই দ্রবণের মধ্যে একটি চিনির দানা সুতোয় বেঁধে ধারকের সাহায্যে ঝুলিয়ে দিয়ে রেখে দিলে কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা যাবে ঝুলন্ত চিনির দানার গায়ে দ্রবণের চিনি এসে লেগে একটি বেশ বড়ো স্ফটিক তৈরি করেছে। প্রকৃতপক্ষে দোকানে যে মিছরি বা ফটকিরি কিনতে পাওয়া যায় সেগুলি ঐভাবেই তৈরি করা হয়।

লবণজল থেকে লবণ পৃথক ক'রে নিতেও আমরা ঐ কেলাসন পদ্ধতি-কাজে লাগাই।

নির্বীজন (Sterilization)

পাতন-প্রণালীতে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। আবার আস্রাবণ ও পরিস্রাবণ ক্রিয়ায় জল থেকে অদ্রাব্য পদার্থ মুক্ত করা যায় বটে, তবে তাতে রোগবীজাণু থেকে যেতে পারে এবং ঐ রোগবীজাণু দেহের ক্ষতি করে। সেইজন্য পানীয় জল বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত করার জন্য বিশেষ কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ঐ প্রক্রিয়াগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

(1) **জল ফুটিয়ে নেওয়া**—জলকে কোন পাত্রে আধঘণ্টা সময় পর্যন্ত ফুটিয়ে নিলেই জলের সর্বপ্রকার রোগবীজাণু মারা যায়। ঐ জলকে ঢাকা দিয়ে রেখে শীতল করা হয়। তারপর তাকে ছেঁকে নিলেই অদ্রবণীয় দূষিত পদার্থ মুক্ত হয়ে যায়। এতে দ্রবীভূত লবণজাতীয় পদার্থগুলি ঠিকই থাকে ব'লে পানের পক্ষে এই জল উপকারী।

(2) **রাসায়নিক পদার্থ মেশানো**—ফটকিরি, ব্লিচিং পাউডার, পটাশ পারমাঙ্গানেট, চুন প্রভৃতি কয়েক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য রোগবীজাণু ধ্বংস করতে পারে। সুতরাং এক বা একাধিক ঐ দ্রব্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে দু'এক দিন রেখে পরে সেই জলকে পরিস্রুত ক'রে নিলেই তা পানের উপযুক্ত হয়। অবশ্য এইরূপ জল একটু বিস্বাদ লাগতে পারে।

(3) **অতিবেগুনি রশ্মি সাহায্যে**—প্রখর সূর্যরশ্মির মধ্যে অতিবেগুনি রশ্মি নামক একপ্রকার আলোক-রশ্মি থাকে। এই আলোক-রশ্মির জীবাণুনাশের ক্ষমতা আছে। সুতরাং প্রখর সূর্যালোকে জলপাত্র রেখে দিলেও জলের মধ্যকার রোগবীজাণু মারা যায়। কৃত্রিমভাবেও এই রশ্মি সৃষ্টি করা যায় এবং তার সাহায্যে জল থেকে রোগবীজাণু দূর করা হয়।

প্রশ্নাবলী

1. জলের দ্রাব্যতা বলতে কি বোঝ? জলের দ্রাব্যতা কিসের উপর নির্ভর করে?

2. বৃষ্টিচক্র বলতে কি বোঝ? জীবজগতের উপর তার প্রভাব কি?

3. পানীয় জলের বিশুদ্ধিকরণে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত?

4. পাতন-প্রণালীতে জল বিশুদ্ধ করা যায় কি ভাবে তা বর্ণনা কর।

5. কেলাস কাকে বলে? কি ভাবে তুঁতের কেলাস তৈরি করবে?

6. একটি পরীক্ষা সাহায্যে পরিস্রাবণ প্রণালী বর্ণনা কর।

7. বাষ্পীভবন বলতে কি বোঝায় বল। বাষ্পীভবন কিসের উপর নির্ভর করে তা উদাহরণ সাহায্যে বোঝাও।

8. জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন বলতে কি বোঝ? জলের কঠিনীভবন কাকে বলে?

9. জল কি কি প্রকারে দূষিত হতে পারে? বিভিন্ন প্রকার দূষিত পদার্থের নাম কর।

10. আস্রাবণ প্রণালীতে কি ধরনের দূষিত পদার্থ জল থেকে দূর করা যায় বর্ণনা কর।

11. নির্বীজন বলতে কি বোঝ? ঐ প্রণালীটি বিভিন্ন উপায়ে কি কাজে লাগানো যায়?

অনুশীলনী

1. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) দ্রবণে যে বস্তু দ্রবীভূত হয় তার নাম —।

(খ) উষ্ণতা বাড়ালে জলের — বাড়ে।

(গ) যে প্রণালীতে জল বাষ্পে পরিণত হয় তাকে বলে জলের —।

(ঘ) আস্রাবণ প্রণালীতে আমরা জলের — বড়ো দানার পদার্থগুলি পৃথক করতে পারি।

(ঙ) পাতন প্রণালীতে আমরা জলে — ও — উভয় প্রকার পদার্থই পৃথক করতে পারি।

(চ) পাতন প্রণালীতে জলে দ্রবীভূত — পদার্থকে পৃথক করা যায় না।

(ছ) জলের বাষ্পীভবন যে তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলি যথাক্রমে (1) —— (2) —— (3) ——।

(জ) তাপ হারিয়ে বাষ্পের তরলে পরিণত হওয়ার নাম বাষ্পের —।

(ঝ) তাপ হারিয়ে জলের বরফে পরিণত হওয়ার নাম জলের —।

(ঞ) জীবজগতের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যেত জলের—না চললে।

(ট) চিনির জল থেকে মিছরি তৈরি করা হয়—পদ্ধতিতে।

(ঠ) তরলের—ও তারপর—, পাতনক্রিয়ার মূলনীতি।

2. নিম্নলিখিত বাক্যগুলির পার্শ্বে লিখিত বাক্যাংশের যেটি ঠিক সেটি রেখে অন্যটি কেটে দাও।

(ক) পাতিত জল প্রয়োজন হয় (1) ঔষধ প্রস্তুতে, (2) পানের জন্য।

(খ) পানীয় জলে পটাশ পারমাঙ্গানেট মেশানো হয় (1) সুস্বাদু করবার জন্য, (2) বীজাণুশূন্য করবার জন্য।

(গ) পরিস্রাবণ প্রণালীতে পৃথক করা যায় (1) দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ, (2) অদ্রবীভূত কঠিন পদার্থ।

(ঘ) জল বাষ্পে পরিণত হয়, কেবলমাত্র জল ফোটালে/যে কোনো উষ্ণতায়।

(ঙ) জলের দ্রাব্যতা কমে, উষ্ণতা বাড়ালে/উষ্ণতা কমালে।

(চ) জলীয় বাষ্প উপরে উঠে যায়, বায়ুর চাপে/বায়ু থেকে হাল্কা বলে।

(ছ) পরিস্রাবণ প্রণালীতে যে তরলটি পাওয়া যায় তার নাম, পরিস্রুত/পরিস্রাবণ।

(জ) জলের নির্বীজন সম্ভব, পরিস্রাবণ সাহায্যে/সূর্যালোক সাহায্যে।

3. নিম্নের বাক্যগুলির মধ্যে যেটি ঠিক তার পাশে T এবং যেটি ভুল তার পাশে F লেখ।

(ক) দ্রবণ দ্রাববস্তুতে দ্রবীভূত হয়।

(খ) উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণের ঘনত্ব কমে যেতে থাকে।

(গ) উষ্ণতার পার্থক্য না হ'লে বৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

(ঘ) কেলাস মাত্রেই কঠিন পদার্থ নয়।

(ঙ) পাতিত জলে রোগবীজাণু থাকে না।

(চ) প্রখর সূর্যরশ্মি ফেলে জলের রোগবীজাণু নষ্ট করা সম্ভব।

(ছ) পানীয় জল ফুটিয়ে নেওয়ার চেয়ে পাতিত জল পান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

(জ) ব্লিচিং-পাউডার জলে মিশিয়ে জল বীজাণুশূন্য করা সম্ভব নয়।

(ঝ) ফটকিরির কেলাস ঘনকাকৃতি।

4. পার্শ্ববর্তী শব্দশ্রেণী থেকে যেটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর তা প্রশ্নগুলির শূন্যস্থানে বসাও ঃ—

(ক) আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পানীয়—।	কেলাসন
(খ) জলে দ্রবীভূত হয়—।	বাষ্পীভবন
(গ) জলের জীবাণু মারার পদ্ধতিকে বলে—।	নির্বীজন
(ঘ) জল যে প্রণালীতে বাষ্প হয় তাকে বলে—।	জল
(ঙ) যে প্রণালীতে মিছরি তৈরি হয় তার নাম—।	চিনি
(চ) ফটকিরি, চুন, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতিকে বলে—।	বাষ্পের ঘনীভবন
(ছ) প্রখর সূর্যালোকের মধ্যে থাকে—।	পাতিত জল
(জ) ঔষধ প্রস্তুতে প্রয়োজন হয়—।	উদ্বায়ীপদার্থ
(ঝ) বাষ্পের তরলে পরিণত হওয়ার নাম—।	শীতকের সাহায্যে
(ঞ) পাতন-প্রণালীতে পৃথক করা যায় না—।	রাসায়নিক পদার্থ
(ট) পাতন-যন্ত্রে বাষ্প ঘনীভূত করা হয়—।	অতি বেগুনিরশ্মি

তৃতীয় অধ্যায়

সজীব পদার্থ

পাঠক্রম ঃ

1. **উদ্ভিদ**—মটর গাছের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কার্যসম্বন্ধে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা উদ্ভিদতত্ত্বের অবতারণাই এখানে উদ্দেশ্য।

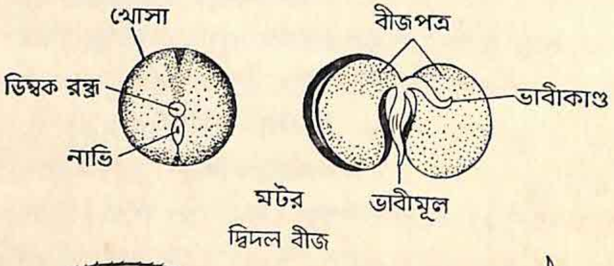
2. **মশার জীবনচক্র**—মশার জীবনচক্র আলোচনার মাধ্যমে জীবতত্ত্বের মৌলিক জ্ঞানদানই উদ্দেশ্য।

3. **ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য**—ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত মৌলিক জ্ঞানলাভে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করাই এই অংশের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে অতি সাধারণ কয়েকটি দুর্ঘটনা সম্বন্ধে প্রাথমিক সাহায্য দেওয়ার শিক্ষাও পাঠ্য-তালিকাভুক্ত।

উপরোক্ত বিষয়গুলি আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রয়োজনমত ছবি, রেখাচিত্র ও মডেল প্রভৃতির সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

1. উদ্ভিদ

আমরা ছোলা, মটর প্রভৃতি ডাল-জাতীয় শস্য দেখেছি। ডাল আমাদের আহার্য বস্তু। ছোলা, মটর প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ। ঐগুলির খোসা ছাড়ালে



মটর

দ্বিদল বীজ



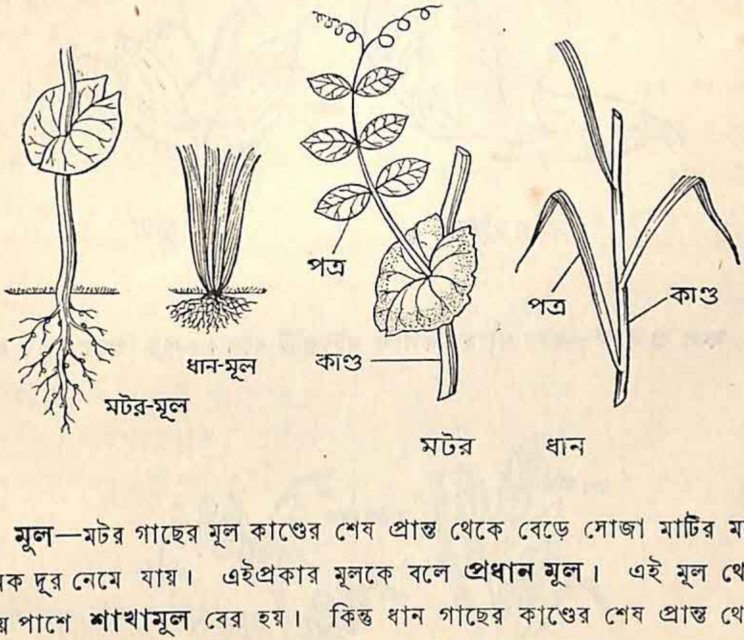
ধান

একদল বীজ

অর্ধ-গোলকের ন্যায় দুইটি খণ্ড একসঙ্গে জোড়া অবস্থায় দেখা যায়। ঐ দুইটি

খণ্ডকে **বীজদল** বলে। অতএব মটর বা ছোলা **দ্বিদল-বীজ**। আবার ধান বা গমের খোসা ছাড়িয়ে দেখা যাবে ঐ ফলের বীজে একটি মাত্র অংশ বা 'দল'। সুতরাং চাউল বা গম **একদল-বীজ**।

সুতরাং আমরা মটর গাছকে বলতে পারি **'দ্বিদল-বীজ' উদ্ভিদ**। আর ধান বা গম গাছকে বলতে পারি **'একদল-বীজ' উদ্ভিদ**। এই দুই প্রকার উদ্ভিদের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা ক'রলে অনেক বিষয়েই পার্থক্য দেখা যাবে।

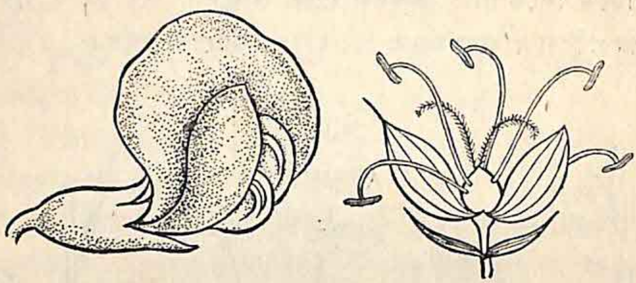


মটর ধান

মূল—মটর গাছের মূল কাণ্ডের শেষ প্রান্ত থেকে বেড়ে সোজা মাটির মধ্যে অনেক দূর নেমে যায়। এইপ্রকার মূলকে বলে **প্রধান মূল**। এই মূল থেকে উভয় পাশে **শাখামুল** বের হয়। কিন্তু ধান গাছের কাণ্ডের শেষ প্রান্ত থেকে এক গোছা সরু সুতোর মত মূল বের হয়ে মাটির ভিতরে কিছুদূর পর্যন্ত প্রবেশ করে। এই ধরনের মূলকে বলে **গুচ্ছমূল**।

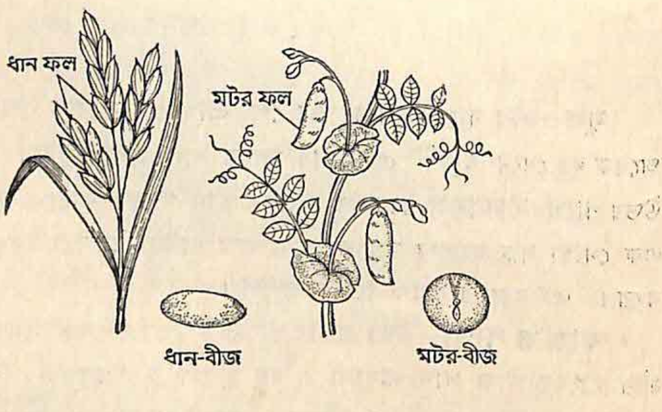
কাণ্ড ও পাতা—উভয় প্রকার গাছের কাণ্ডের গঠনেও অনেক পার্থক্য আছে। মটর গাছের কাণ্ড শাখা-প্রশাখা ও বহু ক্ষুদ্রাকৃতি পত্রযুক্ত। কিন্তু ধানগাছের কাণ্ড শাখা-প্রশাখাশূন্য ও দীর্ঘ পত্রযুক্ত। অবশ্য উভয় প্রকার কাণ্ড সবুজ, সরু, ফাঁপা ও গাঁটযুক্ত। প্রতি গাঁট থেকে উভয়দিকে পর্যায়ক্রমে পাতাগুলি বের হয়ে থাকে। **মটর গাছের পাতাগুলি পক্ষাকার ও জালের মত শিরাবিশিষ্ট।** কিন্তু **ধানগাছের পাতাগুলি সরু ও দীর্ঘ, সূচ্যগ্র ও সমান্তরাল শিরাবিশিষ্ট।**

ফুল—উভয় প্রকার গাছের ফুলের গঠনেও অনেক পার্থক্য। মটর ফুলের বোঁটা আছে। ফুলে মোট 5টি দল বা পাপড়ি। কিন্তু ধান গাছের কাণ্ডের শীর্ষে ধানের মঞ্জরী বা শীষ বের হয়। শীষের কয়েকটি শাখা-প্রশাখা থাকে। এদের প্রত্যেকটিতে বোঁটাহীন ধান-ফুল জন্মায়।



মটর ফুল **ধান ফুল**

ফল ও বীজ—মটর গাছের ফলকে মটরশুঁটি বলে। এর ভিতরে এক সারি



বীজ একধারে সাজানো থাকে। ধানের মঞ্জরীতে অনেকগুলি ফল থাকে। প্রত্যেকটি ফলের খোসা ছাড়ালে একটি মাত্র বীজ পাওয়া যায়।

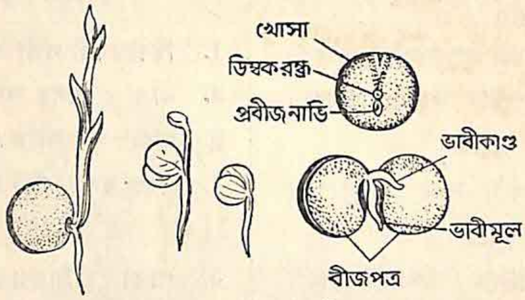
ধান ও মটর গাছের বিভিন্ন অংশের সংক্ষিপ্ত তুলনা

ধান গাছ	মটর গাছ
1. একবীজপত্রী তৃণজাতীয় উদ্ভিদ।	1. দ্বিবীজপত্রী লতা গাছ।
2. বীজ ও ফলের আবরণ সংযুক্ত।	2. বীজ ও ফলের আবরণ পৃথক।
3. গুচ্ছমূল আছে।	3. প্রধান মূল আছে।
4. কাণ্ড কিছুটা সরল ও ফাঁপা। স্পষ্ট গাঁট আছে।	4. কাণ্ড দুর্বল, গাঁট খুব স্পষ্ট নয়।
5. পাতা মৌলিক। আকর্ষ নেই। পাতার গোড়া কাণ্ডকে ঢেকে রাখে। পাতার আগা ছুঁচলো। শিরবিন্যাস সমান্তরাল।	5. পাতা যৌগিক। পাতার আগার অনুফলক আকর্ষে রূপান্তরিত হয়। পাতার শিরবিন্যাস জালশিরা-বিশিষ্ট। পাতার গোড়ায় দু'টি বড় উপপত্র থাকে।
6. ফুলে বোঁটা নেই। বৃতি ও দল নেই। চারটি পৌষ্পিকপত্র ফুলকে ঘিরে থাকে। ছ'টি পুংকেশর ও একটি গর্ভকেশর থাকে। পাখির পালকের মত দু'টি গর্ভমুণ্ড আছে।	6. ফুলে বোঁটা থাকে। পাঁচটি বৃত্যংশসহ বৃতি থাকে। দলে পাঁচটি অসমান পাপড়ি থাকে। দশটি পুংকেশর (ন'টি মিলিত, একটি আলাদা) ও একটি গর্ভ-কেশর থাকে। গর্ভকেশরে একটি গর্ভমুণ্ড থাকে।
7. ফল অস্ফোটক ও নীরস। প্রতি ফলে একটিমাত্র বীজ।	7. ফল স্ফোটক। দুই খণ্ডে ফাটে। প্রতিফলে কয়েকটি বীজ থাকে।
8. বর্ষজীবী উদ্ভিদ।	8. বর্ষজীবী উদ্ভিদ।
9. বর্ষার ফসল।	9. শীতের ফসল।

মটর গাছের বিভিন্ন অংশ

মটর বীজের গঠন। মটরশুঁটি মটর গাছের ফল। মটর তার বীজ। একটি শুষ্ক মটর পরীক্ষা ক'রে দেখা যায় খোসার উপরে একস্থানে একটা সাদা

দাগ রয়েছে। ঐটিকে বলে প্রবীজনাভি (Hilum 'হাইলাম')। ঐস্থানে মটরশুঁটির মাঝে বীজটি লেগে থাকে।



একটি মটর বীজ জলে একদিন ভিজিয়ে রেখে দিলে দেখা যাবে বীজটি ঈষৎ ফুলে উঠেছে। বীজটি হাতে নিয়ে একটু চাপ দিলে দেখা যাবে প্রবীজনাভির কাছাকাছি একটি ছিদ্র দিয়ে সামান্য জল বেরিয়ে এল। ঐ ছিদ্রটিকে বলা হয় ডিম্বক-রন্ধ্র (micropyle 'মাইক্রোপাইল')। ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে মটর বীজ জল শোষণ করে ফুলে উঠেছে। 24 ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর কতকগুলো মটর বীজ নিয়ে একটা মাটির সরায় ভিজে করাতের গুঁড়োর উপর (বা ভিজে মাটির উপর) রেখে দেওয়া হ'ল। দু'তিনদিন পরে দেখা যাবে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে। অর্থাৎ বীজ থেকে **ভাবীমূল** বের হয়েছে। বীজটি যেভাবেই মাটিতে পড়ুক না কেন ঐ ভাবীমূল বেঁকে মাটির ভিতরে প্রবেশ করে। তারপর বৃদ্ধি পেয়ে প্রধান মূলে পরিণত হয়। এই প্রধান মূলের গা থেকে ছোট যে মূলগুলি বের হয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে, সেইগুলিকে **শাখামূল** বলে।

ভাবীমূল বের হবার পর কয়েক দিনের মধ্যেই ভাবীকাণ্ডটি বের হয়, এবং ধীরে ধীরে উর্ধ্বে আলোকের দিকে বেড়ে চলে। এই ভাবীকাণ্ডই কালক্রমে শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফলযুক্ত কাণ্ডের রূপ নেয়।

একটি জলে-ভেজা মটর বীজ খোসা ছাড়িয়ে তার দুটো দলকে সাবধানে পৃথক করলে দেখা যাবে উভয় প্রান্ত ছুঁচলো যার সঙ্গে বীজদল দুটো জোড়া থাকে। এই অংশটিকেই বীজের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা শিশু-উদ্ভিদ বা **ভ্রূণ** বলে। শিশু-উদ্ভিদের ঘুম ভাঙা অর্থাৎ বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য প্রয়োজন হয় জল, বায়ু ও প্রয়োজনমত তাপ। এর যে কোনো একটার অভাব হ'লে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না।

মূল ও মূলের কাজ—মটর গাছের ভাবীমূল মাটির মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর তার গা থেকে শাখামূল ও শাখামূল থেকে আরও ছোট মূল বের হয়, যাকে **প্রশাখা মূল** বলে। প্রতিটি মূল যাতে সহজে মাটি ভেদ ক'রে যেতে পারে তারজন্যই এই মূলগুলির আগায় থাকে একপ্রকার শক্ত আবরণ। ঐ আবরণের নাম **মূলত্রাণ**। মূলত্রাণের ঠিক উপর থেকে সরু সরু চুলের আকারে মূল বের হয়। এগুলোর নাম **মূলরোম**। এই মূলরোমের সাহায্যে মূল মাটি থেকে রস শোষণ করে। সেই রস মূলের শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়ে কাণ্ডে পৌঁছে দেওয়াই মূলের প্রধান কাজ। এছাড়া গাছকে শক্ত ক'রে মাটির সঙ্গে আটকে রাখাও মূলের অন্যতম কাজ। মটর-মূলের (এবং প্রত্যেক শিমজাতীয় উদ্ভিদের মূলের) গায়ে থাকে একপ্রকার গুটি। এই গুটিগুলির ভিতর থাকে অতি সূক্ষ্ম আকারের (অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়) একপ্রকার জীবাণু। এই জীবাণুগুলি মাটির মধ্যকার বায়ু থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ ক'রে ঐ উদ্ভিদের খাদ্য-উপযোগী ক'রে দেয়। তার পরিবর্তে তারা মটর গাছ থেকে শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ ক'রে বেঁচে থাকে।

কাণ্ড ও তার কাজ—মটর গাছের কাণ্ড গোলাকার, সবুজ, সরু, ফাঁপা, দুর্বল ও গাঁট সমন্বিত। গাঁট থেকে পর্যায়ক্রমে বিপরীত দিকে পাতা বের



হয়। **দুই গাঁটের মধ্যের অংশকে পাব বলে**। কাণ্ড ও পাতার সংযোগ-স্থলকে **কক্ষ** বলে। প্রত্যেকটি কক্ষ থেকেই কক্ষ-মুকুল বের হয়। ঐগুলি বৃদ্ধি পেয়ে শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করে।

কাণ্ড শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল, ফল ধারণ করে এবং পাতাগুলিকে সূর্য-কিরণে মেলে ধরে। যেদিকে সূর্যকিরণ বেশি সেদিকে কাণ্ড প্রয়োজনমত বেঁকে যায় এবং পাতাগুলিকে সূর্যকিরণ পেতে সাহায্য করে।

মূল ও কাণ্ডের তুলনা

মূল	কাণ্ড
1. মূল প্রায়ই মাটির নিচে অন্ধকারে থাকে। গুলঞ্চলতা বা অর্কিডজাতীয় উদ্ভিদের মূল বায়ুতে ঝোলে এবং কতক বা গাছকে জড়িয়ে থাকে। সুন্দরী, গরান প্রভৃতি গাছের মূল মাটির ভিতর থেকে খাড়াভাবে বাইরে বেরিয়ে আসে—বায়ু সংগ্রহ করার জন্য।	1. কাণ্ড প্রায়ই মাটির উপরে আলোতে থাকে। কচু, হলুদ, আদা প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ড মাটির নিচে থাকে। উদ্ভিদের জন্য তারা খাদ্য সঞ্চয় ক'রে রাখে।
2. সাধারণতঃ মাটির ভিতরে মূলের কোনো রং থাকে না।	2. কাণ্ডের রং সাধারণতঃ সবুজ।
3. মূলের প্রান্তে মূলত্রাণ থাকে।	3. কাণ্ডের প্রান্তে কুঁড়ি থাকে।
4. মূলে কখনও কুঁড়ি বা পাতা জন্মে না।	4. কাণ্ডের গায়ে পাব ও গাঁট থাকে। গাঁট থেকে কুঁড়ি ও পাতা জন্মায়।
5. মূলে মূলরোম থাকে।	5. কাণ্ডের গায়ে সাধারণতঃ কেশ থাকে না।
6. মূলের একমাত্র অংশ শাখামূল।	6. কাণ্ডে পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি বিভিন্ন অংশ থাকে।
7. মূলের কার্য মাটি থেকে খাদ্য-রস শোষণ করা এবং ঐ খাদ্য-রস কাণ্ডে পৌঁছে দেওয়া।	7. কাণ্ডের কার্য মূলদ্বারা শোষিত রস পাতায় প্রেরণ করা, এবং পাতায় তৈরি খাদ্য সর্বাঙ্গে প্রেরণ করা।
8. মূল শাখা-প্রশাখার সাহায্যে উদ্ভিদকে দৃঢ়ভাবে মাটিতে আবদ্ধ ক'রে রাখে।	8. কাণ্ড উদ্ভিদকে আলোকের দিকে প্রসারিত করে—কখনও বা কাণ্ড আকর্ষে পরিণত হয়ে উদ্ভিদকে উপরে উঠতে সাহায্য করে।

পাতা ও তার কাজ—আম, জাম, কাঁঠাল, বট প্রভৃতি গাছের ক্ষেত্রে একটি বোঁটায় একটি মাত্র ফলক থাকে। এই ধরনের পাতাকে আমরা বলি **মৌলিক পত্র**। কিন্তু যদি একটা বোঁটায় একাধিক ফলক থাকে সেই ধরনের পাতাকে আমরা বলি **যৌগিক পত্র**—যেমন, শিমূল, বেল, ছাতিম প্রভৃতি। মটর গাছের পাতাও যৌগিক পত্র। পাতাগুলি পক্ষাকার ও জালশিরাবিশিষ্ট। পাতার আগার অণুফলক আকর্ষে রূপান্তরিত হয়ে গাছকে উপরে উঠতে সাহায্য করে। বোঁটার উভয় পার্শ্বে দুটি বড়ো বড়ো উপপত্র থাকে।

গাছের জীবনরক্ষায় পাতার কাজই সবথেকে বেশি ও দরকারী। আর সব গাছের মত মটর গাছের পাতাও বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়। এটা হ'ল পাতার **শ্বাসকার্য**। দিনরাত সবসময় পাতা শ্বাসকার্য চালিয়ে যাচ্ছে।



মটর পাতার গঠন

পাতার দ্বিতীয় কাজ হ'ল **অঙ্গার-আত্মকরণ**। পাতা এই কাজ শুধু দিনের বেলায় অর্থাৎ সূর্যের আলোকের মধ্যেই করতে পারে। বায়ু থেকে পাতা অঙ্গারাম্ল গ্যাস শোষণ করে। অক্সিজেন শ্বাসকার্যে লাগাবার ফলে, কিছুটা অঙ্গারাম্ল (কার্বন-ডাই-অক্সাইড) পাতার ছিদ্রপথে বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য পাতায় উপস্থিত হয়।

পাতায় থাকে একপ্রকার সবুজকণা (যার জন্য পাতা সবুজ)। এই সবুজ-কণাই অঙ্গারাম্ল থেকে **অঙ্গার (কার্বন)** গ্রহণ করার কার্যে পাতার প্রধান সহায়। এদিকে আবার মাটিতে নানাবিধ খনিজ পদার্থ তরল অবস্থায় মূল কাণ্ড ও পাতার শিরা-উপশিরা দিয়ে ঐ সবুজকণার কাছে উপস্থিত হয়। তখন পাতার

সবুজকণা এবং সূর্যকিরণের সাহায্যে ঐ তরল খনিজ পদার্থগুলির ও অঙ্গারাম্ল গ্যাসের নানারূপ রাসায়নিক ক্রিয়া হয় এবং তার ফলে গাছের খাদ্য তৈরি হয়। এই কার্যের ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে কার্বনটুকুই পাতা কাজে লাগায় এবং অক্সিজেন পাতার ছিদ্রপথে বায়ুমণ্ডলে এসে মিশে যায়। সুতরাং দিনের বেলা পাতা বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বদলে অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। অথচ প্রাণীরা সর্বক্ষণ অক্সিজেনের বদলে বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফিরিয়ে দিচ্ছে। অতএব **বায়ুর মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ স্থির রাখতে উদ্ভিদই একমাত্র সহায়।** নচেৎ প্রাণী অক্সিজেন অভাবে এতদিন ভূপৃষ্ঠে থাকতে পারত না।

পাতার তৃতীয় কাজ হ'ল **প্রস্বেদন**। আমাদের দেহ থেকে যেমন অতিরিক্ত জল ঘাম ও মূত্ররূপে দেহ থেকে বের হয়ে যায়, তেমনি গাছের দেহ থেকেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল পাতার ছিদ্রপথে বাষ্পাকারে বায়ুতে মিশে যায়।

সুতরাং মটরপাতার কাজগুলি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার :—

(1) **আকর্ষরূপে দুর্বল কাণ্ডকে আশ্রয় অবলম্বন ক'রে উপরে তোলা ;**

(2) **শ্বাসকার্য করা ;**

(3) **খাদ্য প্রস্তুত করা ;**

(4) **অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প গাছের দেহ থেকে বাইরে বের করে দেওয়া ;**

(5) **বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ স্থির রাখা।**

পাতা ঐ বিভিন্ন কাজগুলি কেন করে তার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হ'ল।

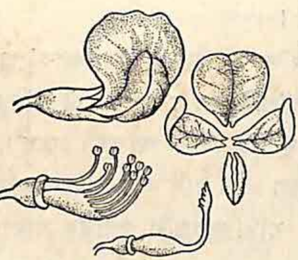
(1) উদ্ভিদের মূল যেমন মাটির ভিতরে যায় খাদ্যরস শোষণের জন্য, কাণ্ডও তেমনি যায় আলোর দিকে সূর্যালোক পাবার জন্য। মটরের কাণ্ড দুর্বল ব'লে খাড়াভাবে আলোর দিকে ঐ কাণ্ড বাড়তে পারে না। তাই পাতা আকর্ষে রূপান্তরিত হয়ে কোনো আশ্রয় - যথা, কোনো গাছ বা দণ্ড অবলম্বন ক'রে কাণ্ডকে উপরে আলোর দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ **কাণ্ডকে আলোর দিকে নিয়ে যাবার জন্যই পাতার ঐ আকর্ষে রূপান্তর।**

(2) শ্বাসকার্য জীবের জীবনরক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। **শ্বাসকার্যের ফলে জীবের দেহের ভিতর তাপের সৃষ্টি হয়।** পাতার ছিদ্রপথে ঐ শ্বাস-কার্য অর্থাৎ অম্লজান গ্রহণ ও অঙ্গারাম্ল ত্যাগ কার্য চলে।

(3) পাতার একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ খাদ্য প্রস্তুত করা। অবশ্য যে সব উদ্ভিদের পাতা নেই তাদের কাণ্ড সবুজ হয়। আর ঐ সবুজ কাণ্ডই খাদ্য প্রস্তুত করে। **উদ্ভিদের দেহ-বৃদ্ধির জন্যই পাতার খাদ্য প্রস্তুত-করণ।**

(4) উদ্ভিদ মূল দিয়ে মাটি থেকে যে খাদ্যরস শোষণ করে তা খুবই তরল অবস্থায়। সুতরাং ঐ খাদ্য পরিপাকের জন্য যতটা জল দেহের পক্ষে প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ জলই উদ্ভিদকে শোষণ করতে হয়। সেইজন্য **পাতার ছিদ্রপথে গাছ অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে বের ক'রে দেয়।**

(5) পাতার অঙ্গারাত্মকরণ (অর্থাৎ খাদ্য প্রস্তুত) ক্রিয়া যে শুধু উদ্ভিদের দেহবৃদ্ধির জন্যেই প্রয়োজন তা নয়—**অঙ্গারাত্মকরণের ক্রিয়ার ফলে পাতার ছিদ্রপথে অম্লজান বায়ুতে ফিরে আসে এবং ঐভাবে বায়ুর অক্সিজেনের পরিমাণ স্থির থাকে।** নচেৎ বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ ধীরে ধীরে ক'মে যেত এবং এতদিনে সমস্ত জীবজগৎ লোপ পেয়ে যেত।



মটর ফুলের গঠন

মটর ফুল—একটি মটর নিয়ে পরীক্ষা করলে তার মধ্যে অনেকগুলি অংশ দেখা যাবে। সবুজ একটি বোঁটায় ফুলটি থাকে। বোঁটার সঙ্গে ফুলের সর্বনিম্ন অংশে সবুজ রংএর বাটির মত একটি অংশ রঙ্গিন **পাপড়ি (দল)** গুলিকে ধ'রে থাকে। এই অংশকে বলে **বৃতি**। বৃতিতে পাঁচটি ভাগ দেখা যায়। প্রত্যেকটির নাম **বৃত্যংশ**। দল সাধারণতঃ বেগুনি বা নীল বর্ণের হয়, কখনও বা সাদাও হয়। দলে 5টি অসমান পাপড়ি থাকে। সবথেকে বড়ো পাপড়িকে **পতাকা** ও দুই পাশের পাখির ডানার মত পাপড়িকে বলে **পক্ষ**। ভিতরে দুটি পাপড়ি জুড়ে গিয়ে নৌকার আকার নিয়েছে। এর নামও তাই **নৌকা**।

এইবার ফুলের পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ফেললে দেখা যাবে সুতোর মত সরু 10টি দণ্ড আছে। এদের নাম **পুংকেশর**। পুংকেশরের দুটি অংশ—সুতোর মতো সূক্ষ্ম নিম্ন অংশকে **সূত্র** এবং ঐ সূত্রের মাথায় মুণ্ডের ন্যায় অংশটিকে **পরাগকোষ** বলে। পরাগকোষের মধ্যে থাকে **পরাগস্থলী**। এর মধ্যে থাকে অসংখ্য **পরাগরেণু**। 10টি পুংকেশর ছাড়া আর একটি মোটা লম্বা ধরনের দণ্ড থাকে। তার নাম **গর্ভকেশর**। গর্ভকেশরের উপরের অংশটি ছোট ও তার মাথায় একটি আঁঠালো মুণ্ড আছে। এটির নাম **গর্ভমুণ্ড**। গর্ভকেশরের নিচের ফোলা অংশের নাম গর্ভকোষ। তার মধ্যে থাকে ছোটো ছোটো গুটির মত **ডিম্বকোষ**।

পুংকেশরের মাথার পরাগকোষ ফেটে তার থেকে ক্ষুদ্র **পরাগরেণু** বেরিয়ে এসে গর্ভমুণ্ডের আঁঠায় লেগে যায়। তারপর ধীরে ধীরে গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়ে গর্ভকোষে গিয়ে পৌঁছোয়। তারফলেই গর্ভকোষটি শেষপর্যন্ত ফলে এবং ডিম্বকোষগুলি বীজে রূপায়িত হয়।

সমগ্র ফুলটির বিভিন্ন অংশের কাজগুলিও বিভিন্ন, যদিও ফুলের সামগ্রিক কাজ হ'ল ফলের সৃষ্টি করা।

বৃতি—বৃতির কাজ হ'ল পাপড়িগুলিকে শক্ত ক'রে ধ'রে রাখা।

দল বা পাপড়ি—পাপড়ি হয় রঙ্গিন। ঐ রঙ্গিন পাপড়িগুলি কীট-পতঙ্গগুলিকে দিনের আলোয় ফুলের দিকে আকর্ষণ করে। ফুলের রঙে আকৃষ্ট হয়ে কীট-পতঙ্গ মধুর লোভে ফুলে এসে বসে এবং পরাগরেণুগুলি গর্ভমুণ্ডে যাতে লেগে যায় তার সাহায্য করে। সাদা ফুলগুলি তাদের সাদা রং ও সৌরভের সাহায্যে রাত্রির অন্ধকারেও কীট-পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে। পরাগকোষ ও গর্ভকোষের কাজ আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।

ফল—মটর ফলের কাজ হ'ল মটর বীজকে অপরিণত অবস্থায় রক্ষা করা। আবার বীজগুলি পুষ্ট হলে এই ফল ফেটে যায় এবং বীজ-বিস্তারে সাহায্য করে। বীজগুলি ফলের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে।

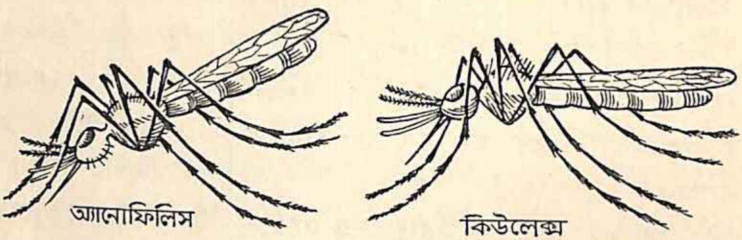
বীজ—বীজের কাজ হ'ল উদ্ভিদের বংশরক্ষায় বা বংশবিস্তারে সহায়তা করা।

উদ্ভিদের অঙ্গার-আত্মকরণ, শ্বাসকার্য ও প্রস্বেদনের তুলনা

অঙ্গার-আত্মকরণ	শ্বাসকার্য	প্রস্বেদন
1. এই ক্রিয়াটি শুধু সূর্যের আলোকেই সম্ভব।	1. এই ক্রিয়াটি দিন-রাত সমানভাবে চলে।	1. দিনে বেশি, রাতে অপেক্ষাকৃত কম।
2. সবুজ পাতা বা সবুজ কাণ্ডদ্বারা এই ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।	2. উদ্ভিদের সকল কোষেরই শ্বাসকার্য আছে।	2. শুধুমাত্র পাতার ছিদ্রপথেই এই ক্রিয়াটি সম্ভব।
3. এই ক্রিয়ার ফলে অম্লজান (অক্সিজেন) অঙ্গারাম্ল(কার্বন-ডাই-অক্সাইড) থেকে পৃথক হয়ে উদ্ভিদের দেহ থেকে বেরিয়ে বায়ু-মণ্ডলে মিশে যায়।	3. বায়ুসমেত অম্লজান পাতার ছিদ্রপথে উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে।	3. উদ্ভিদদেহ থেকে জল বাষ্পাকারে বাইরের বায়ুমণ্ডলে গিয়ে মেশে।
4. বায়ুর অঙ্গারাম্ল পাতার কোষে গিয়ে সবুজ-কণার সঙ্গে মেশে। সেখানে অঙ্গার অংশটি শর্করা-খাদ্য গঠনে লাগে।	4. উদ্ভিদদেহে মৃদু-দহনের ফলে যে অঙ্গারাম্ল তৈরি হয় তা বায়ুমণ্ডলে এসে মেশে।	4. অঙ্গারাম্লের কোনো পরিবর্তন হয় না।
5. অঙ্গার আত্মকরণে উদ্ভিদদেহ ওজনে বাড়ে।	5. শ্বাসকার্যে উদ্ভিদের ওজন কমে।	5. উদ্ভিদের ওজন কমে।

2. প্রাণী ঃ মশার জীবন-চক্র

মশার উৎপাত কোনো-না-কোনো দিন ভোগ করে নি বা মশার কামড় খায় নি এমন লোক বাংলা দেশে নেই, একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবে। অথচ কতো ক্ষুদ্র এই প্রাণী। দু'খানা পাখার জোরে ওড়ে আর তীক্ষ্ণ হুলের জোরে অন্য প্রাণীর দেহের রক্ত শোষণ ক'রে বাঁচে। অবশ্য সব মশাই রক্ত পান করতে পারে না। তারা পচা ফলের রস বা ফুলের মধু পান করে।



মশাকে আমরা পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণী বলি। এই শ্রেণীর প্রাণীর কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। একটি মশা মেরে তাকে অতসী কাঁচ (লেন্স) দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এদের শরীরটা (1) **মাথা** (2) **বুক** ও (3) **পেট** এই তিন ভাগে বিভক্ত। দেহে কোনো হাড় বা **মেরুদণ্ড** নেই। মাথার দুপাশে দুইটি চোখ। চোখের কাছে দুইটি শুঁয়ো থাকে। এই শুঁয়োর সাহায্যেই মশা শব্দ শুনতে পারে বা কোনো বস্তু স্পর্শ ক'রে তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। বুকের সঙ্গে লাগানো তিনজোড়া অর্থাৎ মোট ছয়টি পা। এইকারণে পতঙ্গকে **ষট্‌পদী** বলে। পাগুলো গ্রন্থিযুক্ত। তাই একে **সন্ধিপদ** প্রাণীও বলে। মশার দু'খানা ক'রে ডানা বা পাখা থাকে। উড়বার সময় ঐ পাখার জোরে শব্দ সৃষ্টি করে। মাথার সঙ্গে একটি শোষক-যন্ত্র আছে। স্ত্রী-মশা শোষক-যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত পান করে কিন্তু পুরুষ মশার শোষক-যন্ত্রের আগা ভোঁতা ব'লে রক্তপান সম্ভব হয় না। পুরুষ মশা তাই ফুলের মধু বা পচা ফলের রস পান করে।

নানাজাতীয় মশা

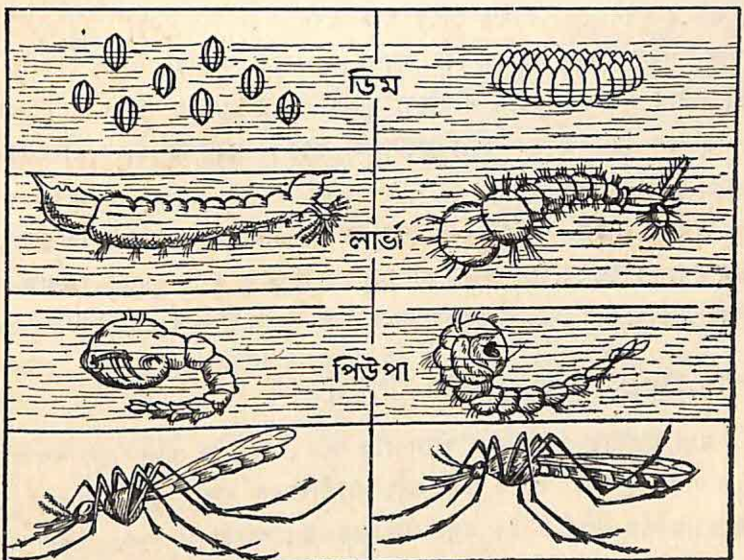
মশা প্রধানতঃ তিন প্রকার ঃ—(1) অ্যানোফিলিস—ম্যালেরিয়া জীবাণুবাহক ; (2) কিউলেক্স—ফাইলেরিয়া বা গোদের জীবাণুবাহক ; (3) ষ্টেগোমিয়া—ডেঙ্গু রোগের জীবাণুবাহক।

অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স—এই দুইজাতীয় মশা আমরা সচরাচর দেখি। অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশা চিনে নেওয়া যায় তাদের বসবার ধরন দেখে। অ্যানোফিলিস মশা তার দেহকে বসবার জায়গায় প্রায় 45° ডিগ্রি কোণ ক'রে বসে। কিউলেক্স মশা তার দেহকে বসবার জায়গার সাথে সমান্তরাল রেখে বসে।

মশার রূপান্তর

মশার জীবনকালকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—(1) ডিম, (2) শূক বা লার্ভা, (3) পিউপা ও (4) ইমাগো বা পূর্ণাঙ্গ অবস্থা।

মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশার জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু খুঁটিনাটিভাবে দেখলে দেখা যায় যে জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় উভয় শ্রেণীর মশার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। পার্থক্যগুলি চিত্রের সাহায্যে দেখানো হ'ল এবং আলোচনা করা হ'ল।



অ্যানোফিলিস কিউলেক্স

ডিম—অ্যানোফিলিস মশা পরিষ্কার ও প্রশস্ত জলাশয়ে ডিম পাড়ে।

অ্যানোফিলিসের ডিম পৃথক পৃথক ভাবে জলে ভাসে। কিউলেক্স মশা যে কোনো প্রকার জলেই ডিম পাড়ে। ডিমগুলি একত্রে গায়ে গায়ে লেগে জলে ভাসে। সাধারণতঃ দু'তিনদিনের ভিতরেই ডিম ফুটে লার্ভা বা শূককীট বের হয়।

লার্ভা—লার্ভার দেহ লম্বা আকারের ও রোঁয়া-যুক্ত। অ্যানোফিলিসের লার্ভা দেহকে জলতলের সমান্তরাল রেখে ভাসে। কিউলেক্সের লার্ভাগুলো জলের নিম্নে মাথা নিচু ক'রে থাকে। লেজের দিকে শ্বাসগ্রহণের জন্য একটি লম্বা নল থাকে। জলের উপরে ঐ নল তুলে ধ'রে এগুলি শ্বাসগ্রহণ করে। শূককীটগুলি ভয়ানক ক্ষুধার্ত থাকে। এগুলি জলজ উদ্ভিদ ও জলের পোকা খেয়ে জীবনধারণ করে। এই অবস্থায় শূককীটগুলি আট-দশ দিনের মধ্যে দু'-তিনবার খোলস ছেড়ে বৃদ্ধি পায়। এইভাবে শূককীটগুলির দেহ পূর্ণতা পায়। তখন এগুলি শান্ত হয়ে পড়ে। মাথার দিকটা ক্রমশঃ ফুলে ওঠে। আহার বন্ধ হয়ে আসে। শূককীট-জীবনের এ হচ্ছে শেষ অবস্থা।

পিউপা বা মূককীট অবস্থা—শূককীটের মাথার দিকটা ফুলে ওঠে এবং দেহ গুটিয়ে যখন বঁড়শির মত বেঁকে যায় তখন এরা আর কিছুই খায় না। এই অবস্থার নামই পিউপা বা মূককীট অবস্থা। এদের মাথার দিকে দু'টি শুঁড়ের মতো পদার্থ থাকে। তার সাহায্যে মূককীট শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। এই অবস্থায় এরা দু'তিন দিন জলের মধ্যে ছুটোছুটি করে। তারপর ধীরে ধীরে তাদের চঞ্চলতা ক'মে আসে।

পূর্ণাঙ্গ মশক অবস্থা—তারপর খোলস ফেটে যায় এবং ভিতর থেকে পূর্ণাঙ্গ মশা বাইরে বেরিয়ে এসে ভাসমান খোলসের উপর একটু বিশ্রাম নেয়। পাখার জল শুকিয়ে গেলেই এরা বাতাসে ডানা মেলে উড়ে যায়।

মশার প্রকৃতি ও জীবনযাত্রা প্রণালী

মশা অন্ধকার ও ছায়াযুক্ত স্থানে বাস করে। আলো ও বাতাসে এরা থাকতে পারে না। ফুল ও ফলের রস এবং প্রাণীদেহের রক্তই এদের প্রধান খাদ্য। অ্যানোফিলিস জাতীয় স্ত্রী মশা মারাত্মক ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে। ঐ জীবাণু এদের দেহের কোনও ক্ষতি করতে পারে না। ঐজাতীয় পুরুষ মশার শিঙ ভোঁতা ব'লে প্রাণীদেহের গায়ে তা বেঁধেনা। পুরুষ মশা তাই শুধু ফুলের মধু বা পচা ফুল বা ফলের রস খেয়ে বাঁচে।

মশার দংশন থেকে অব্যাহতি

মশার দংশন থেকে অব্যাহতি পেতে হলে মশার জন্মবিস্তারে বাধা দেওয়াই প্রধান উপায়। ডিম অবস্থায় বা শূক অবস্থায় এদের ধ্বংস করা উচিত। মশা যেসমস্ত জায়গায় ডিম পাড়ে ঐসব জায়গায় জলের উপর কেরোসিন তেল বা প্যারিস-গ্রীন ছড়িয়ে দিতে হয়। খানা, ডোবা প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় জলাশয় বুজিয়ে দিতে হয়। ঘরে ধূপ-ধুনো দেওয়া বা ডি-ডি-টি নামক একপ্রকার ঔষধ ছড়িয়ে দেওয়াও মশা নিবারণের উপায়। মশার উৎপাত বেশি হলে মশারি টাঙিয়ে শোওয়া উচিত।

মশার রূপান্তর

অ্যানোফিলিস	কিউলেক্স
1. অ্যানোফিলিস মশা পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে।	1. কিউলেক্স পরিষ্কার বা অপরিষ্কার সর্বপ্রকার জলে ডিম পাড়ে।
2. অ্যানোফিলিসের ডিম আলাদা আলাদা ভাবে জলে ভাসে।	2. কিউলেক্সের ডিম একসঙ্গে অনেক-গুলো জোট বেঁধে ভাসে।
3. অ্যানোফিলিসের শূককীট দেহকে জলতলের সমান্তরাল ক'রে জলের মধ্যে ভাসে।	3. কিউলেক্সের শূককীট জলের মধ্যে মুখ নিচের দিকে এবং পিছনটাকে উপরে রেখে ভাসে।
4. অ্যানোফিলিস মশার ডানায় কালো কালো দাগ দেখা যায়।	4. কিউলেক্সের ডানায় কালো দাগ দেখা যায় না।
5. অ্যানোফিলিস মশা উড়বার সময় ডানায় শব্দ হয় না।	5. উড়বার সময় কিউলেক্স মশার ডানায় শব্দ হয়।
6. অ্যানোফিলিস মশা যখন কোথায়ও বসে তখন মুখ নিচু ক'রে পশ্চাৎ-ভাগ উঁচু ক'রে বসে।	6. কিউলেক্স মশা যে বস্তুর উপর বসে তার সঙ্গে দেহটি সমান্তরাল ক'রে রাখে।
7. স্ত্রী অ্যানোফিলিসের শুঁড় খুব লম্বা।	7. স্ত্রী-কিউলেক্সের শুঁড় খুব ছোট।
8. অ্যানোফিলিস মশা রাত্রে বের হয়।	8. কিউলেক্স সব সময়ই বের হয়।
9. অ্যানোফিলিস মশা (স্ত্রী) ম্যালে-রিয়ার জীবাণু বহন করে ও রোগ ছড়ায়।	9. কিউলেক্স মশা ফাইলেরিয়া বা গোদের জীবাণু বহন করে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যই মানবের পরম সম্পদ। ব্যক্তির জীবনে স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। সুগঠিত নীরোগ লোককেই আমরা স্বাস্থ্যবান বলে থাকি। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির জীবন দুঃখে ভরা।

বিশুদ্ধ পানীয়, পুষ্টিকর খাদ্য, শারীরিক ব্যায়াম, বিশ্রাম ইত্যাদি নানাপ্রকার স্বাস্থ্যবিধি পালনই সুন্দর স্বাস্থ্যলাভের উপায়।

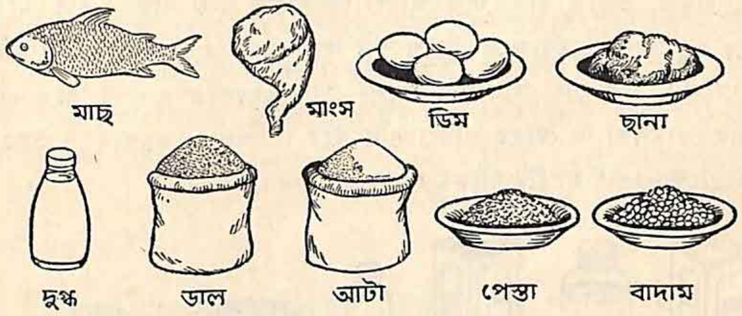
বিশুদ্ধ পানীয় জল—স্বাস্থ্যরক্ষার একটি প্রধান উপায় হ'ল বিশুদ্ধ জল পান করা। দূষিত জলের মধ্য দিয়ে আমাদের দেহে রোগবীজাণু প্রবেশ ক'রে দেহকে রোগজীর্ণ ক'রে তোলে। জল-বাহিত রোগের মধ্যে টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক। গভীর নলকূপ বা গভীর পাকা কূপের জল অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। যদি পানীয় জল নদী, হ্রদ বা পুকুর থেকে নেওয়া হয় তাহ'লে সে জল ফুটিয়ে ও তারপর পরিস্রাবণ প্রণালীতে অদ্রবীভূত ময়লা পরিষ্কার ক'রে পান করা উচিত। বিশেষতঃ যখন কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের আক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে তখন পানীয় জল বিশুদ্ধ ক'রে পান করা অবশ্য কর্তব্য। পানীয় জল বিশুদ্ধ হ'লেই চলে না। যে পাত্রে পানীয় জল রাখা হয় বা যে পাত্র থেকে জল পান করা হয় ঐগুলিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখা উচিত। ফুটন্ত জলে পাত্র ধুয়ে নিলে পাত্র জীবাণুমুক্ত হয়।

পুষ্টিকর খাদ্য—বিশুদ্ধ পানীয় জলের পরেই বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্যই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপাদান।

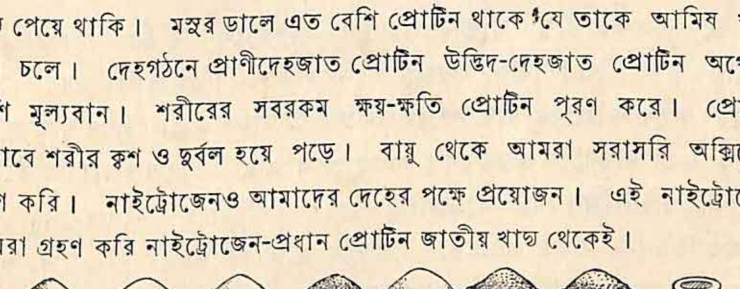
পুষ্টিকর খাদ্য নির্বাচনে আমাদের জানতে হবে কোন্ কোন্ প্রকার খাদ্য আমাদের দেহগঠনের পক্ষে বা দেহকে সবল ও কর্মঠ রাখার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। মোটামুটিভাবে দেহগঠনের পক্ষে নিম্নলিখিত প্রকার খাদ্যগুলির প্রয়োজন আছে।

(1) **প্রোটিন বা আমিষজাতীয় খাদ্য,**
(2) **শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাদ্য,**
(3) **চর্বিজাতীয় খাদ্য,**
(4) **লবণজাতীয় খাদ্য,**
(5) **ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ,**
(6) **জল।**

বিভিন্ন প্রকার খাদ্য আমাদের দেহের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন মেটায়। এদের মধ্যে আমিষজাতীয় খাদ্য (ছানাজাতীয় খাদ্য বা প্রোটিন), লবণ ও জল আমাদের দেহগঠনে ও তার ক্ষয়পূরণে সাহায্য করে। চর্বি ও শর্করা জাতীয় খাদ্য দেহের কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে ও উত্তাপ সৃষ্টি করে। ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণগুলি আমাদের দেহের অভ্যন্তরে রোগজীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার ক্ষমতা সৃষ্টি করে।



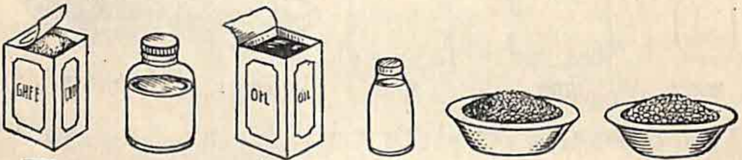
1. **প্রোটিন বা আমিষজাতীয় খাদ্য**—মাছ, মাংস, ডিমের শ্বেত অংশ, ছানা, দুধ, ডাল, আটা, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি খাদ্য থেকে আমরা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য পেয়ে থাকি। মসুর ডালে এত বেশি প্রোটিন থাকে যে তাকে আমিষ খাদ্য বলা চলে। দেহগঠনে প্রাণীদেহজাত প্রোটিন উদ্ভিদ-দেহজাত প্রোটিন অপেক্ষা বেশি মূল্যবান। শরীরের সবরকম ক্ষয়-ক্ষতি প্রোটিন পূরণ করে। প্রোটিন অভাবে শরীর কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। বায়ু থেকে আমরা সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করি। নাইট্রোজেনও আমাদের দেহের পক্ষে প্রয়োজন। এই নাইট্রোজেন আমরা গ্রহণ করি নাইট্রোজেন-প্রধান প্রোটিন জাতীয় খাদ্য থেকেই।



2. **শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় খাদ্য**—আটা, ময়দা, সুজি, চাল, চিড়ে, মুড়ি, সাগু, বার্লি, আলু, কচু, ওল, গাজর প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য।

চিনি, গুড়, মধু, মিছরি, নানাবিধ গাছ বা ফলের মিষ্টিরস প্রভৃতি খাদ্যে শর্করা বা চিনি থাকে। এই জাতীয় খাদ্য দেহের মধ্যে মৃদু দহন-ক্রিয়ার ফলে দেহে উত্তাপ সৃষ্টি করে। এ ছাড়া দেহে চর্বিও সৃষ্টি করে। এই প্রকার খাদ্যের প্রধান উপাদান অঙ্গার (কার্বন), হাইড্রোজেন ও অম্লজান (অক্সিজেন)।

3. **চর্বিজাতীয় খাদ্য**—মাখন, ঘি, তেল, প্রাণীদেহজাত চর্বি, দুধ, পেস্তা, বাদাম, প্রভৃতি খাদ্য থেকে আমরা চর্বিজাতীয় খাদ্য পাই। চর্বি দেহের ভিতরে মৃদু দহন-কার্যের ফলে উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং দেহের মধ্যে মেদ (চর্বি) রূপে থাকে। এই চর্বি আমাদের দেহের তাপ-নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে এবং চামড়ার কোমলতা ও দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি করে। অঙ্গার, অম্লজান ও উদজান (হাইড্রোজেন) এই জাতীয় খাদ্যের প্রধান উপাদান।



ঘৃত মধু তৈল দুগ্ধ পেস্তা বাদাম

4. **লবণজাতীয় খাদ্য**—আমাদের দেহগঠনে বিভিন্ন প্রকার লবণ প্রয়োজন হয়। শাক-সবজি, ফলমূল, দুধ প্রভৃতিতে বিভিন্ন প্রকার লবণ থাকে। সাধারণ লবণ আমাদের খাদ্য প্রস্তুতে নিত্যই প্রয়োজন হয়। লবণ খাদ্য সুস্বাদু করে। লবণ অস্থিগঠনে ও রক্তরস (রক্তের তরল অংশ) প্রস্তুতেও সাহায্য করে।

5. **ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ**—যথেষ্ট পরিমাণে নানাধরনের খাদ্য খেলেও ভিটামিন নামক একপ্রকার উপাদান আমাদের শরীরে না গেলে, শরীর দুর্বল ও সহজেই নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তাজা ফল, শাক-সবজি প্রভৃতির মধ্য দিয়েই এই উপাদানটি আমাদের দেহে প্রবেশ করে। নানা-ধরনের ভিটামিন আছে। একটি থেকে আর একটির পার্থক্য বোঝাতে এদের নাম দেওয়া হয়েছে ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, কে, ইত্যাদি। বেরিবেরি, স্কার্ভি, রিকেট প্রভৃতি নানাধরনের রোগ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভিটামিনের অভাবে হয় এ কথা আজ জানা গেছে।

খাদ্যপ্রাণের প্রয়োজন দেহের পক্ষে এতো বেশি বলে সেসম্বন্ধে অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজনীয় ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হ'ল।

A-ভিটামিন

(1) এই খাদ্যপ্রাণটি পাওয়া যায়—মাখন, ঘি, দই, ডিমের হলুদ অংশ, কড্ মাছের তেল, চিতল, কই, ও ইলিশের তেল, টাটকা শাক-সবজি, বাঁধাকপি, পালং শাক, টম্যাটো, বেগুন, গাজর, পাকা-পেঁপে, আম প্রভৃতিতে।

(2) এই খাদ্যপ্রাণটি আমাদের দেহের বৃদ্ধি ও দেহের পুষ্টি সাধন করে। দেহে রোগ প্রতিরোধকারী শক্তি আনে। চোখের অসুখ নিবারিত হয়।

(3) এই খাদ্যপ্রাণের অভাবে ক্ষুধা নষ্ট হয়, শরীরের ওজন কমে, চোখের অসুখ হয়, এমন কি পাইওরিয়া (দাঁতের রোগ), চর্মরোগ এবং যক্ষ্মা রোগও সহজেই দেহ আক্রমণ করে।

B-ভিটামিন

(1) এই খাদ্যপ্রাণটি পাওয়া যায় ঢেঁকিছাঁটা চাল, অঙ্কুরিত গম, মাছ, ডাল, শাক-সবজি প্রভৃতিতে।

(2) এই খাদ্যপ্রাণটি দেহের শক্তিবৃদ্ধি করে, দেহের পুষ্টি সাধন করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, রোগ প্রতিরোধ করে।

(3) এই খাদ্যপ্রাণের অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়—যাতে হাত-পা প্রভৃতি ফুলে যায়। দেহ দুর্বল ও খর্বাকার হয়, অম্লপীড়া ও খাদ্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হয়।

C-ভিটামিন

(1) এই খাদ্যপ্রাণটি টাটকা শাক-সবজি, টাটকা ফল, অঙ্কুরিত ছোলা-মটর এবং বিশেষভাবে কমলালেবু, পাতিলেবু, আনারস, টম্যাটো এবং আমলকিতে পাওয়া যায়।

(2) এই খাদ্যপ্রাণটি দেহের অস্থিগুলিকে পুষ্ট করে, দাঁত ভালো রাখে, পেটের পীড়া আরাম করে, 'স্কার্ভি' রোগ নিবারণ করে।

(3) এই ভিটামিনের অভাবে 'স্কার্ভি' নামক রোগের সৃষ্টি হয়। দাঁতের গোড়া ফোলা, মাথা ধরা, রক্তপাত, পেটের পীড়া, দেহের গাঁটে গাঁটে বেদনা প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করে।

D-ভিটামিন

(1) এই খাদ্যপ্রাণটি কড লিভার তেলে, দুগ্ধে, দুগ্ধজাত দ্রব্যে, ডিমে ও শাক-সবজিতে পাওয়া যায়। সূর্যের আলোয় দেহের মধ্যে আপনা থেকেই এই খাদ্যপ্রাণটি সৃষ্টি হয়।

(2) এই খাদ্যপ্রাণটি দেহের হাড় ও দাঁত গঠনে বিশেষভাবে শিশুদের দেহ-গঠনে খুবই কার্যকরী।

(3) এই খাদ্যপ্রাণের অভাবে শিশুরা দুর্বল ও ক্ষীণজীবী হয়। তারা 'রিকেট' নামক রোগে আক্রান্ত হয়।

K-ভিটামিন

(1) শাক-সবজিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। মাখন, টম্যাটোতেও এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

(2) রক্তপাত হলে এই খাদ্যপ্রাণটির জন্যই রক্ত দ্রুত জমে যায় ও রক্তপাত বন্ধ হয়, দাঁতের ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

(3) এই ভিটামিনের অভাবে দেহের কোনো জায়গা কেটে গেলে রক্ত বন্ধ হয় না।

6. **জল**—দেহগঠনে যেমন বিভিন্ন প্রকার খাদ্য প্রয়োজন, তেমনি ঐ খাদ্য পরিপাক করতে এবং তরল অবস্থায় দেহের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেবার জন্য জলের প্রয়োজন। জল রক্তের তরলতা বজায় রাখে। শরীরের দূষিত অংশ ঘাম ও মূত্র রূপে দেহের বাইরে বের ক'রে দিতে সহায়তা করে। প্রতিদিন অন্ততঃ 1 লিটার জল পান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। আমরা খাদ্যের সাথে মিশ্রিত অবস্থায়ও অনেকটা জল পান করি। এছাড়াও আমাদের জল পান করা উচিত। পরীক্ষায় জানা গেছে যে, আমাদের দেহের মোট ওজনের শতকরা প্রায় 70 ভাগই জল।

পুষ্টিকর খাদ্য—আমাদের দেহ গঠনের ও সংরক্ষণের জন্য খাদ্যগ্রহণ প্রয়োজন এবং বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য প্রয়োজন এও সত্য, কিন্তু ঐ খাদ্য কোন্ প্রকার কতটা গ্রহণ করা উচিত সে সম্বন্ধেও একটা নিয়ম আছে। বৈজ্ঞানিক-গণ নানাপ্রকার পরীক্ষা ক'রে স্থির করেছেন যে বয়স, পরিশ্রম, শরীরের গঠন, শারীরিক অবস্থা, এমন কি যে অঞ্চলে আমরা বাস করি, সেই অঞ্চলের পক্ষে প্রয়োজন বুঝে আমাদের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য-উপাদানের পরিমাণ স্থির হওয়া উচিত। বিভিন্ন অবস্থা বিচারে যেরূপ খাদ্য আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী

তাকেই আমরা **পুষ্টিকর খাদ্য** বলতে পারি। সাধারণ পরিশ্রমী নিরামিষভোজী ও আমিষভোজী কোনো পূর্ণবয়স্ক ভারতবাসীর পক্ষে সারাদিনে কোন্‌প্রকার খাদ্য কতটা প্রয়োজন তার একটা মোটামুটি হিসাব নিচে দেওয়া হ'ল।

পুষ্টিকর খাদ্য

আমিষভোজী				নিরামিষভোজী			
		কিলোগ্রাম	গ্রাম			কিলোগ্রাম	গ্রাম
1.	চাউল বা আটা	0	470	1.	চাউল বা আটা	0	470
2.	ডাল	0	90	2.	ডাল	0	90
3.	তরকারি	0	290	3.	তরকারি	0	290
4.	ঘি বা মাখন	0	90	4.	ঘি বা মাখন	0	90
5.	চিনি বা গুড়	0	60	5.	দুধ	0	470
6.	মাছ বা মাংস বা ডিম	0	230	6.	চিনি বা গুড়	0	60
7.	লবণ	0	14	7.	লবণ	0	14
8.	কিছু শাক-সবজি	——		8.	কিছু শাক-সবজি	——	

প্রতিদিনের প্রতিবেলার খাদ্যতালিকা

অধিক খরচের মধ্যে না গিয়ে প্রতিবেলায় বাংলা দেশের একটি শিক্ষার্থীর যে পরিমাণ খাদ্য শরীর গঠনের পক্ষে প্রয়োজন তার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

সকালে—কল বেরুনো ভিজে ছোলা 60 গ্রাম এবং তার সঙ্গে সামান্য পরিমাণ গুড়। সম্ভব হলে 230 গ্রাম দুধ (গরুর দুধ বা গুঁড়ো দুধ)।

দুপুরে—প্রায় 200 গ্রাম চালের ভাত। ঘন ডাল, শাক-সবজির তরকারি, মাছ বা মাংস, লেবু।

বিকালে—মুড়ি, চিড়ে বা ছাতু যে কোনো পদ এবং একটু গুড়, কোনো রকম ফল—যেমন কলা, পেঁপে, পেয়ারা, আম, জাম যে কোনো প্রকার। ফল অভাবে ফলের আচার।

রাত্রিতে—ভাত বা আটার রুটি, ডাল, তরকারি।

উপরোক্ত খাবার খেলে এবং নিয়মিত সময়ে খেলে ও নিয়মিত ব্যায়াম করলে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। তবে মাঝে মাঝে লক্ষ্য রাখতে হবে খাবার

যেন একঘেয়ে না হয়। সাধ্যমত তালিকার মধ্যে অদল বদল করে নিতে হবে বা প্রস্তুতির দিকে লক্ষ্য রেখে স্বাদের ও রুচির পরিবর্তন করতে হবে।

ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেহগঠন ও সংরক্ষণ করার জন্য যেমন প্রয়োজন খাদ্যের, তেমনি সেই দেহকে সুগঠিত ও কর্মক্ষম রাখার জন্য প্রয়োজন নিয়মিত ব্যায়ামের। আমাদের দেহ একটি যন্ত্রের মত। যন্ত্রের প্রত্যেকটি অংশ চালু না রাখলে বা তার প্রতি যত্ন না নিলে পুরো যন্ত্রটিই যেমন এক সময় অকেজো হয়ে পড়ে—আমাদের দেহ সম্বন্ধেও ঐ কথাই খাটে। **দেহ-যন্ত্রের প্রতিটি অংশকে চালু রাখা অর্থাৎ কর্মঠ রাখার জন্য যে অঙ্গ-সঞ্চালন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তাকেই আমরা ব্যায়াম বলে থাকি।**

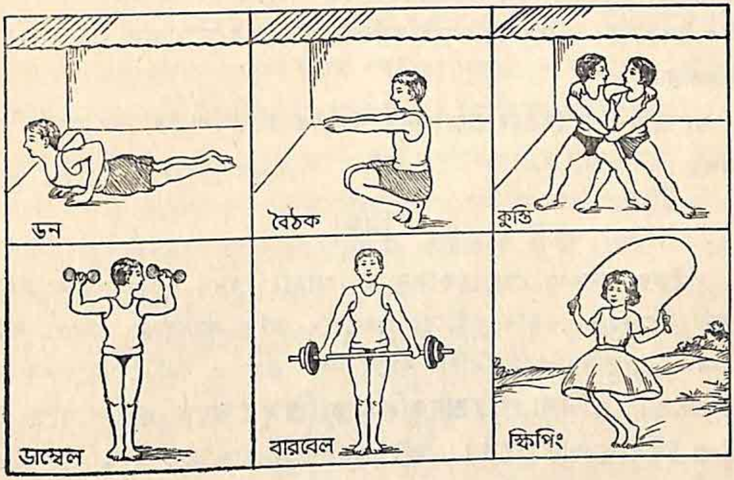
ব্যায়াম করলে আমাদের হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুততর হয়ে ওঠে। এর ফলে দেহের ভিতরের প্রতিটি অংশ তার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও রক্তসরবরাহ পায়। অক্সিজেনপূর্ণ বিশুদ্ধ রক্ত দেহের ভিতরে বিভিন্ন অংশে পৌঁছে সেখান থেকে দূষিত বস্তুগুলি নিয়ে আসে। তারপর ফুসফুস থেকে নিঃশ্বাস বায়ুর সঙ্গে ঐ দূষিত পদার্থের কিছু অংশ দেহের বাইরে চলে যায়। ব্যায়াম করার সময় প্রচুর ঘাম হয়। তার ফলে দেহের কতকগুলো ময়লা ঘামের সঙ্গে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়। ব্যায়ামের ফলে দেহের প্রতিটি অঙ্গের মাংসপেশীসমূহ সুগঠিত হয়। স্নায়ুমণ্ডলী সতেজ হয়ে ওঠে। মোটের উপর নিয়মিত ও পরিমিত ব্যায়ামে দেহের লাবণ্য বাড়ে। সুন্দর দেহশ্রী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অনিয়মিত ব্যায়াম বা অতিরিক্ত ব্যায়াম স্বাস্থ্যের হানি করে। বয়স অনুসারে ছোট শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক ধরনের ব্যায়াম করবার ব্যবস্থা আছে। অভিজ্ঞ ব্যায়াম শিক্ষকের কাছে তা জানা যায়।

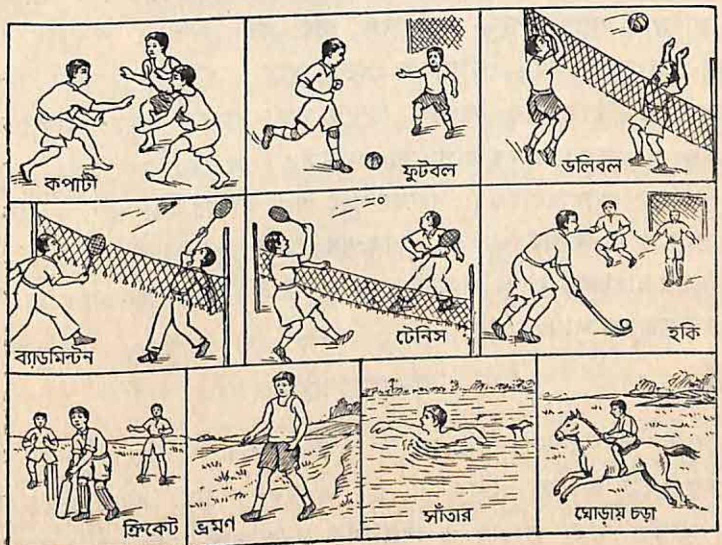
বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াম—শুধুমাত্র দেহ-গঠন বা দেহকে কর্মঠ রাখার জন্যই যে মানুষ ব্যায়াম করে তা নয়। ব্যায়াম করার মাধ্যমে যাতে দেহ-মনে আনন্দের সৃষ্টি হয়, তার দিকে লক্ষ্য রেখেও বহুপ্রকার ব্যায়াম-প্রণালীর সৃষ্টি হয়েছে। এর কতকগুলো জীবনের নানাবিধ কাজে সাহায্য করে এবং কতকগুলো আকস্মিক বিপদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে।

মোটামুটিভাবে ব্যায়ামকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। একটিকে বলতে পারি গৃহাভ্যন্তরস্থ ব্যায়াম, অপরটিকে বলা যায় মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম।

গৃহাভ্যন্তরের ব্যায়াম—ডন, বৈঠক, কুস্তি, ডাম্বেল, বারবেল, স্কিপিং ইত্যাদি।



মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম—কপাটি, ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস, হকি প্রভৃতি খেলা এবং ভ্রমণ, সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া, দৌড়-ঝাঁপ



নৌকাচালানো ইত্যাদি মুক্ত বায়ুর ব্যায়াম। আজকাল N. C. C.-ভুক্ত ছাত্রদের মুক্তবায়ুতে নিয়মিত ব্যায়াম করার ব্যবস্থা আছে।

ঘরের মধ্যকার ব্যায়াম অপেক্ষা মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক উপকারী। তবে সব সময়ই **অতিরিক্ত দেহ-সঞ্চালন দেহের পক্ষে ক্ষতিকর।**

ব্যায়ামের পর বিশ্রাম প্রয়োজন। দেহের প্রয়োজন মত বিশ্রামগ্রহণ অতি আবশ্যক।

নিদ্রা

পুষ্টিকর খাদ্য ও দেহ সঞ্চালন বা ব্যায়াম যেমন শরীর গঠনে সহায়ক, উপযুক্ত বিশ্রামও তেমনি শরীরের ক্ষয়পূরণে অতি আবশ্যক। নিদ্রা সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্রাম। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে শয়ন করা ও নির্দিষ্ট সময়ে শয্যাত্যাগ করা উচিত। **সুনিদ্রা পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করে এবং দেহে নূতন বল ও উৎসাহ সৃষ্টি করে।** দৈহিক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া ইত্যাদি মানসিক শ্রমও আমরা করি। নিদ্রা আমাদের দেহের ও মনের ক্লান্তি দূর করে। সুনিদ্রা দীর্ঘ সময়ের জন্য আমাদের দেহ ও মনকে বাইরের জগতের কাজ ও চিন্তা থেকে দূরে নিয়ে যায়। তাই **সুনিদ্রা সর্বপ্রকার বিশ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।**

সুনিদ্রার পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত। পরিষ্কার শয্যা, আলো-হাওয়াযুক্ত ঘর; কোলাহল থেকে দূরে, শান্ত পরিবেশ সুনিদ্রার সহায়ক। এগুলি ছাড়াও কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। শয়নের পূর্বে হাত-মুখ ও পা ধোওয়া উচিত। গরমের সময় ভিজে তোয়ালে দিয়ে গা-মোছা আরামদায়ক। শয়নের পূর্বে অল্প আহার করা ভালো—গুরুপাক দ্রব্য আহার না করাই উচিত। নাক-মুখ ঢেকে শোওয়া ভালো নয়। এতে শ্বাসক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি হয়। শয়নের সময় খুব আঁটসাঁট পোশাক না প'রে ঢিলে পোশাক পরা ভালো।

অভ্যাস গঠন

স্বাস্থ্য আমাদের পরম সম্পদ। সুস্থ শরীর আমাদের সুন্দর জীবন যাপনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সুস্থ ও সবল শরীর লাভ করতে হ'লে যেমন আমরা খাদ্য, ব্যায়াম ও বিশ্রামের উপর লক্ষ্য রাখব তেমনি কতকগুলি

বিশেষ নিয়ম পালনও আমাদের ঐ বিষয়ে সাহায্য করে। ঐ নিয়মগুলি পালন করলে বা নিয়মিতভাবে অনুসরণ করলে অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন আর সেগুলি পালনে কোনো বিশেষ মন দিতে হয় না। কথায় বলে 'মানুষ অভ্যাসের দাস'। কোনো বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তা পালন করতে আর কোনো অসুবিধা বোধ হয় না। সেইজন্য সু-অভ্যাস গঠনে সবসময়ে সচেষ্ট হতে হবে। শরীর ও মনের পক্ষে উপযুক্ত অভ্যাসগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রধান :—

পোশাক-পরিচ্ছদ—আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে সাধারণ। যেরকম অঞ্চলে মানুষ বাস করে তার পোশাক-পরিচ্ছদ হবে সেই অঞ্চল অনুযায়ী। গরমের দেশে আমরা বাস করি। আমাদের পোশাক হবে তাই সুতী কাপড় বা রেশম বস্ত্রের তৈরি। রেশম বস্ত্র অতি মূল্যবান তাই সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী নয়। সুতী কাপড়ের তৈরি পোশাকই আমাদের নিত্যব্যবহার্য হওয়া উচিত। কিন্তু সর্বদাই তা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। কোনরূপ ময়লা পোশাক পরা কখনই উচিত নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা অভ্যাস করলে তখন আর ময়লা পোশাক পরার ইচ্ছাও করে না। পোশাক পরিষ্কার রাখার জন্য তখন নিজের একটু পরিশ্রম স্বীকারেও ইচ্ছা হয়। সাবান দিয়ে নিজের পোশাক নিজে পরিষ্কার রাখার অভ্যাস গঠনও এই সঙ্গে করা উচিত। সাদা পোশাক-পরিচ্ছদে সামান্য ময়লা ধরলেই তা বোঝা যায় কিন্তু রঙিন পোশাক ময়লা হলে তা বোঝা যায় না। কিন্তু ঐগুলিই ক্ষতিকর। তাই দু'তিনদিন পর পরই নিজের পোশাক নিজে ধুয়ে বা সাবান দিয়ে পরিষ্কার রাখা উচিত। শুধু ধুতি-চাদর, শার্ট, পাঞ্জাবী, কোট, প্যাণ্ট, গেঞ্জি বা ফতুয়া প্রভৃতি পোশাক ছাড়াও জুতো, মোজা প্রভৃতি এবং তোয়ালে, গামছা ইত্যাদি পরিষ্কার ক'রে ব্যবহার করা উচিত।

শরীরের পরিচ্ছন্নতা—পোশাক-পরিচ্ছদ যেরূপ নিয়মিতভাবে পরিষ্কার রাখা অভ্যাস করা উচিত সেরূপ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও নিয়মিতভাবে পরিষ্কার রাখা উচিত। দেহের কতকগুলি অঙ্গ কমবেশি সবসময় বাইরের ধুলো-বালির স্পর্শে আসে। আবার দেহের মধ্যেও দূষিত পদার্থ সৃষ্টি হয়। দেহকে ঐ উভয় প্রকার ময়লা থেকে মুক্ত রাখা অভ্যাসসাপেক্ষ। দেহের ভিতরের দূষিত পদার্থ মল, মূত্র ও ঘর্মরূপে দেহের বাইরে আসতে চায়। এটাই জীবদেহের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং মল-মূত্রত্যাগ বিষয়ে নিয়ম পালন করা উচিত। সকালে ও বিকালে

দুইবার মলত্যাগের অভ্যাস গঠন করা উচিত। তাতে পেটের পীড়া সৃষ্টি হ'তে পারে না। শরীর সুস্থ থাকে। আবার দেহের লোমকূপ পথে ঘাম বের হয়। বাতাসে ভাসমান ধুলো-বালি ঐ লোমকূপ বন্ধ করে দেয়। সেইজন্য নিয়মিতভাবে গা মেজে বা মাঝে মাঝে গায়ে সাবান ঘষে স্নান করার অভ্যাস গঠন করা উচিত।

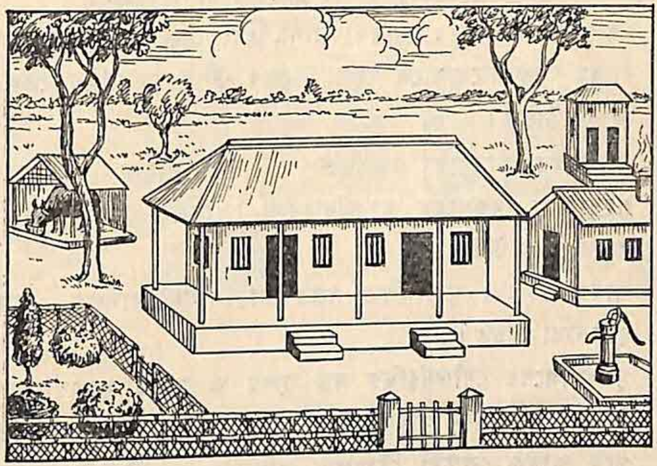
দাঁত ও জিহ্বা আমাদের পরিপাকযন্ত্রের অঙ্গস্বরূপ। আহার গ্রহণের পর উত্তমরূপে মুখ না ধুলে দাঁতের ফাঁকে খাদ্যের অংশবিশেষ লেগে থাকে এবং তা পচে গিয়ে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে এবং দাঁতের গোড়া ক্ষয় ক'রে দেয়। ঐ অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ করলে ঐ খাদ্যও দূষিত অবস্থায় উদরে প্রবেশ করে ও উদরের পীড়া ঘটায়। সেইজন্য প্রতিদিন সকালে যেমন ভালোভাবে দাঁত মেজে মুখ ধোওয়া উচিত, তেমনি প্রতিবার আহারের পর এমনভাবে মুখ ধুতে হবে যাতে মুখের মধ্যে বা দাঁতের ফাঁকে কোনো প্রকার খাদ্যকণা না লেগে থাকে। এইটি একটি অতি প্রয়োজনীয় অভ্যাস। দাঁত মাজার জন্য আমাদের উচিত নিমের ডাল ব্যবহার করা অথবা ভালো ব্রাশ ব্যবহার করা। ব্রাশ ব্যবহার করলে ঐ ব্রাশটিকেও প্রতিবারে উত্তমরূপে গরম জলে ধুয়ে রাখা উচিত। দাঁতের মাজন ব্যবহার করলে তাও যেন ভালো শ্রেণীর হয়।

দেহত্বকের লোমকূপগুলি ও দাঁত পরিষ্কার রাখা যেমন অবশ্য কর্তব্য, তেমনি দেহের অন্যান্য অঙ্গ—যেমন হাত, পা, চোখ, কান, নাক, চুল প্রভৃতিও পরিষ্কার রাখা উচিত। হাতপায়ের নখ কাটা, নিয়মিতভাবে চুলকাটা ও পরিষ্কার রাখা, নাকের ছিদ্র পরিষ্কার রাখা, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ পরিষ্কার করা—এইগুলি অবশ্যপালনীয় কাজ।

নিয়মিতভাবে ঐগুলি পালন করলে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। তখন শতকাজের মধ্যেও অভ্যাস পালনে ভুল হয় না। আর স্বাস্থ্যহানিরও ভয় থাকে না।

পরিবেশ-পরিচ্ছন্নতা—মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। আমরা যেস্থানে এবং যে সমাজে বাস করি সেইস্থান এবং সমাজ আমাদের দেহ ও মনের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব ভালো ও মন্দ দুইই হতে পারে। একেই বলি আমরা পরিবেশের প্রভাব। যদি এই পরিবেশ পরিচ্ছন্ন না হয় অর্থাৎ যদি তা আমাদের শরীর ও মনের ক্ষতিকারক হয় তবে আমাদের জীবনে শান্তি থাকে না। আমাদের বাসগৃহ ও বাসস্থানের আবহাওয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। বাসগৃহ প্রচুর আলোবাতাসযুক্ত হ'লে ও চারপাশের জায়গাটি

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'লে আমাদের দেহ ও মন সুস্থ থাকে, প্রফুল্ল থাকে। ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যেমন উচিত তেমনি চারপাশের স্থানগুলি



জঙ্গলমুক্ত ও ময়লাশূন্য রাখা উচিত। ময়লা-জল নিকাশের ভালো ব্যবস্থা রাখা উচিত। পায়খানা এবং গৃহপালিত পশুগুলির গৃহ, বাসগৃহ থেকে একটু দূরে রাখা উচিত। শহরাঞ্চলে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত চেষ্টা সবসময় কার্যকরী হয় না। সেখানে ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করে একটি সংস্থা। তাকে আমরা বলি 'করপোরেশান' বা 'মিউনিসিপ্যালিটি'। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব তাঁরা অনেকাংশে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহ'লেও গৃহের ভিতরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের। এবিষয়ে যদি আমরা নিজেদেরকে অভ্যস্ত না ক'রে তুলি তবে তা আমাদের শরীর ও মনের ক্ষতি করবেই। **পরিবেশ পরিচ্ছন্ন না থাকলে শরীর রোগাক্রান্ত হয়, কর্মে উৎসাহ থাকে না, জীবন অশান্তিময় হ'য়ে ওঠে।**

পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হ'লে নিম্নলিখিত বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

1. নিয়মিতভাবে প্রতিদিন প্রতিটি ঘর পোঁছা বা লেপা, প্রতিসপ্তাহে একবার ক'রে ঘরের ঝুল ঝাড়া ও ঘরদোর ধোয়া উচিত।
2. বিছানাপত্র নিয়ম ক'রে রৌদ্রে দেওয়া ও পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত।

3. শয়নঘরে অতিরিক্ত আসবাবপত্র না রাখা ও সর্বদা আলো-বাতাস যাতে আসতে পারে, তার জন্য জানলাগুলো খুলে রাখা কর্তব্য।
4. রান্নাঘর ও খাবার ঘর খুবই যত্নে পরিষ্কার রাখা উচিত।
5. ময়লা জল নিকাশের সুব্যবস্থা রাখা, এবং ড্রেন বা নর্দমায় মশার সৃষ্টি না হয় এজন্য মাঝে মাঝে ময়লা জলের উপর কেরাসিন তেল ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।
6. বাসগৃহের চারধার জঙ্গলমুক্ত ও আবর্জনামুক্ত রাখতে হবে। শহরাঞ্চলে নিজগৃহের আবর্জনাগুলো 'আবর্জনা-ফেলার' জন্য নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলা উচিত।
7. পায়খানা এবং গৃহপালিত পশুর আবাসস্থান বাসগৃহ থেকে একটু দূরে করা উচিত।
8. গৃহ-প্রাঙ্গণের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য সুন্দর ও সুগন্ধি ফুলের বাগান করা উচিত। ফুল মনে আনন্দ আনে এবং পবিত্র ভাবের সৃষ্টি করে।
9. গৃহে কারও কোনো ছোঁয়াচে রোগ হলে, রোগীকে পৃথক ঘরে, খুব পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখা উচিত।
10. প্রতিদিন প্রতিটি ঘরে ধূপ-ধুনো দেওয়া উচিত। মাঝে মাঝে বাসগৃহে, পশুর বাসস্থানে, গৃহ-প্রাঙ্গণে ডি. ডি. টি. ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। বাসগৃহকে দেবমন্দির জ্ঞান ক'রে তাতে সর্বদা একটা পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত।

গৃহে সম্ভাবিত আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা

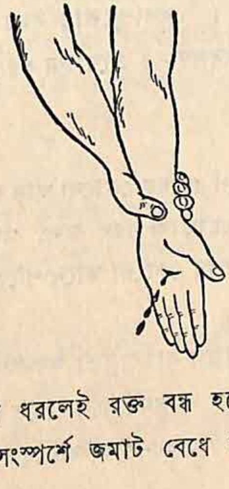
শরীর গঠন ও স্বাস্থ্য বজায় রাখার নিয়মগুলি যথাযথ পালন করলেও অনেক সময় আকস্মিকভাবে আমরা কতকগুলো দুর্ঘটনায় পড়ি। তৎক্ষণাৎ সেগুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক চিকিৎসা না করলে গুরুতরভাবে পীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়তে হয় বা জীবন সংশয় হয়। সুতরাং আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রত্যেক গৃহে টিংচার আইওডিন, টিংচার বেঞ্জিন, ডেটল, পটাশ পারমাঙ্গানেট, লাইজল প্রভৃতি কয়েকটি জীবাণুনাশক ওষুধ, কিছু পরিষ্কার কাপড়, কিছু জীবাণুমুক্ত তুলো, একটি

ছোটো ধারালো ছুরি ও একখানা ছোটো কাঁচি রাখা প্রয়োজন। ঘরে খানিকটা ময়লাশূন্য স্পিরিট এবং আইওডেক্স ও বার্নল জাতীয় ওষুধ রাখাও ভালো।



1. কেটে যাওয়া

শরীরের কোনো স্থান ধারালো অস্ত্রে কেটে যেতে পারে, অথবা কোনো কঠিন বস্তুতে ঘষা লেগে বা পড়ে গিয়ে অথবা পেরেক ফুটে দেহে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। ক্ষত সৃষ্টি হলে প্রথমেই রক্ত বন্ধ করা প্রয়োজন। **রক্ত যদি উজ্জ্বল লাল বর্ণের হয় এবং ফিনকি দিয়ে বের হয় তবে মনে রাখতে হবে ধমনী কেটে গেছে, আর রক্ত যদি কালচে রঙের হয় এবং যদি দরদর ধারায় বের হতে থাকে তবে বুঝতে হবে শিরা কেটে গেছে।** অনেক



সময় ক্ষতস্থান জোরে চেপে ধরলেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। রক্ত দেহের বাইরে বেরিয়ে এসে অক্সিজেনের সংস্পর্শে জমাট বেঁধে যায় এবং ক্ষতস্থান থেকে রক্ত

বেরুবার পথ বন্ধ ক'রে দেয়। গভীর ক্ষত থেকে অনেক সময় এত জোরে রক্ত বের হয় যে তা বন্ধ করা কঠিন। শিরা কেটেছে বুঝতে পারলে, ক্ষতস্থানের নিচে বাঁধন দিতে হবে আর ধমনী কেটেছে বুঝলে ক্ষতস্থানের উপরে বাঁধন দিতে হয়। টিংচার আইওডিন মাখা বীজাণুশূন্য তুলো দিয়ে তখন ক্ষতস্থান পরিষ্কার ক'রে, পরিষ্কার একটু তুলো ঐ ক্ষতস্থানে চেপে ধ'রে রাখতে হয়। ঐস্থান কখনও জল দিয়ে ধুতে নেই।

এইভাবে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ডাক্তারের সাহায্য নিতে হয়। কারণ অনেক সময় ক্ষতস্থান দিয়ে রোগজীবাণু দেহে প্রবেশ করে। টিটেনাস্ নামক রোগজীবাণু খুবই মারাত্মক। সন্দেহ হলে ঐ রোগের প্রতিষেধক ইন্‌জেকশান্ (অ্যান্টিটিটেনাস্ ইন্‌জেকশান্) নিতে হয়।

2. গায়ের চামড়া ছড়ে যাওয়া বা কালশিরা পড়া

অনেক সময় কঠিন বস্তুর সঙ্গে ঘর্ষণে চামড়া ছ'ড়ে যায় বা আঘাতে শরীরের কোনো স্থান ফুলে ওঠে এবং ঐ স্থানে কালচে দাগ পড়ে। চামড়া কেটে রক্ত বের না হ'তে পেরে ঐ রক্ত দেহের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে জমাট বেধে ঐরূপ কালচে দেখায়। আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের চামড়া ছ'ড়ে গেলে, জীবাণুশূন্য তুলো স্পিরিটে ভিজিয়ে ঐ স্থান মুছে দিতে হয়। আইওডেক্স লাগিয়েও উপকার পাওয়া যায়। শুধু আঘাত লেগে ফুলে উঠলে বরফ, জলপটি বা স্পিরিট লাগিয়েও আরাম পাওয়া যায়। খেলা-ধুলোর সময় প্রায়ই ঐ ধরনের আঘাত লাগে এবং দ্রুত সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।

3. আগুনে পোড়া

আগুনের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে দেহের কোনো স্থান পুড়ে গেলে আমরা আগুনে পোড়া বা অগ্নিদাহ বলি। এছাড়াও গরম জল, গরম বাষ্প, ফুটন্ত দুধ, তেল, ভাতের মাড় প্রভৃতিও শরীরের কোনো স্থানে প'ড়ে যে অবস্থার সৃষ্টি করে তাকে আমরা ঝলসানো বলি।

এই দুর্ঘটনাটি সম্বন্ধে নিম্নরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত :

(1) কাপড় বা পোশাকে আগুন লেগে গেলে দৌড়াদৌড়ি না ক'রে মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি দেওয়া উচিত। আগুন-লাগা ব্যক্তিকে ভারি কম্বল বা কাঁথা-জাতীয়

কোনো কিছু দিয়ে জড়িয়ে ধরলে আগুন দ্রুত নিভে যায়। অক্সিজেনের অভাব হলে আগুন জ্বলতে পারে না। সেইজন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা করা হয়।



(2) আগুন নিভে গেলে রোগীকে পরিষ্কার চাদর বা পরিষ্কার অয়েল ক্লথের (বা রবার ক্লথের) উপর শুইয়ে দিতে হয়।

(3) ক্ষতস্থানে কোনো ময়লা লেগে গেলে জীবাণুশূন্য তুলো জলপাই তেলে বা পরিষ্কার নারিকেল তেলে ভিজিয়ে ময়লা মুছে নিতে হয়।

(4) ক্ষতস্থানে জল লাগানো উচিত নয়। ক্ষতস্থান খোলা না রেখে, জলপাই তেল বা পরিষ্কার নারিকেল তেলে পরিষ্কার ন্যাকড়া বা তুলো ভিজিয়ে ক্ষতস্থান ঢেকে রাখা উচিত।

(5) ঝলসানো জায়গায় আলুবাঁটা, চুনের জল ও নারিকেল তেলের মিশ্রণ বা ডিমের সাদা অংশ প্রলেপ দিলে ক্ষত দ্রুত সেরে যায়। আজকাল বার্নল (Burnol) নামক ওষুধটি ঐক্ষেত্রে খুবই উপকার দেয়।

(6) অগ্নিদাহ যেরূপই হোক না কেন ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

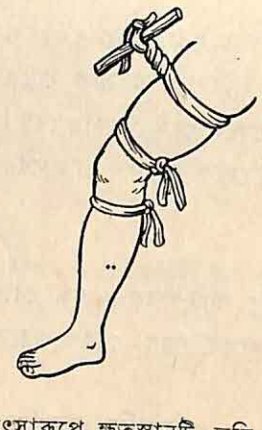
4. দংশন

গৃহ-পরিবেশে নানারূপ কীট-পতঙ্গ—যথা, বোলতা, ভীমরুল বা কাঁকড়া-বিছার দংশনে অনেক লোককেই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে সর্পদংশনও মারাত্মক বিপদ।

(1) **বিছা, বোলতা, মৌমাছি প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের দংশন—** কীট-পতঙ্গগুলি দেহের মধ্যে হুল ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দেয় এবং অনেক সময় ঐ হুল ভেঙ্গে দেহের ভিতরেও রয়ে যায়। একটি ছিদ্রযুক্ত চাবি আহত-স্থানে বসিয়ে

চাপ দিলে হুলটি বের হয়ে আসে। ঐ স্থানে টিংচার আইওডিন বা স্পিরিট লাগালে যন্ত্রণার লাঘব হয়। পেঁয়াজের রস বা চুন লাগিয়ে দিলেও যন্ত্রণা কমে। কাঁকড়া-বিছার দংশন সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক। গরমজলে পটাশ পারমাঙ্গানেট মিশিয়ে আহতস্থানে লাগালে যন্ত্রণা কমে। এই ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

(2) **সর্প দংশন**—পাড়াগাঁয়ে অনেক স্থানে বর্ষাকালে ভয়ানকভাবে সাপের উপদ্রব হয়। বিষাক্ত সাপের দংশনে প্রতি বৎসর আমাদের দেশে বহুলোক মারা যায়। বিষাক্ত সাপে কামড়ালে ক্ষতস্থানে ঃ এই রকম দুইটি চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু নির্বিষ সাপে কামড়ালে ক্ষতস্থানে ঃঃ এইরূপ চারটি চিহ্ন দেখা যায়। বিষাক্ত সাপ দংশনের সাথে সাথে তার মাথাটা ঈষৎ হেলিয়ে দেয় এবং বিদ্যুৎবেগে বিষ গিয়ে ক্ষতস্থানের রক্তে মিশে যায়। তারপর ধীরে ধীরে সেই বিষ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে ও রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়। হাতে বা পায়ে সাপে কামড়ালে তৎক্ষণাৎ ক্ষতস্থানের উপরে পরপর তিনটি বাঁধন দিতে হয়। বাঁধনগুলি খুব শক্ত ক'রে দেওয়া উচিত যাতে রক্ত চলাচল না করতে পারে। হাতের কাছে দড়ি না পেলে, কাপড়ের পাড় ছিঁড়েও বাঁধন দিতে দ্বিধা করা উচিত নয়। এরূপ করলে বিষ সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়তে



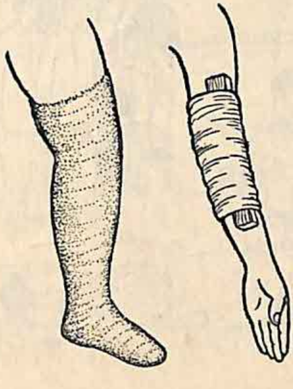
পারে না। প্রাথমিক চিকিৎসারূপে ক্ষতস্থানটি ছুরি দিয়ে কেটে দিতে হবে। বিষাক্ত রক্ত তখন দেহের বাইরে বেরিয়ে যাবে। এইসময় গরম জলের সঙ্গে পটাশ পারমাঙ্গানেট মিশিয়ে ঐ জল দিয়ে অনবরত ক্ষতস্থান ধুয়ে

দিতে হবে। ইতিমধ্যে চিকিৎসককে সংবাদ দিয়ে এনে তার পরামর্শ মতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রাম্য ওঝার কথায় বিশ্বাস ক'রে বাঁধন খুলে দেওয়া কখনই উচিত নয়।

হাত, পা ছাড়া দেহের অন্য কোনো অংশে সর্পদংশন খুবই মারাত্মক হয়ে পড়ে। তখন ক্ষতস্থান চিরে রক্ত বের করে দেওয়া ও পটাশ পারমাঙ্গানেটের গুঁড়ো ক্ষতস্থানে লাগিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। সর্পদংশনে এন্টিভেনম্ ইন্‌জেকশান্ বা মিহিজামের 'লেক্সিন'এর গন্ধ সেবন, এক্ষেত্রে বিশেষ উপকার দেয়।

5. মচকানো বা হাড়ভাঙ্গা

অনেক সময় খেলতে খেলতে বা উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা মচকে যায় বা হাড় ভেঙ্গে যায়। হাড় ভেঙ্গে গেলে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। মচকে গেলে ঐ স্থানে বরফ লাগালে আরাম পাওয়া যায়। 'গুলার্ডস্ লোশান' বলে একরকম ওষুধ পাওয়া যায় ডাক্তারখানায়। তাতে নেকড়া ভিজিয়ে আহত স্থানে পটি বেঁধে দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। মচকানো স্থানে হলুদবাটা ও চুন একত্র মিশিয়ে অল্প গরম ক'রে লাগালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

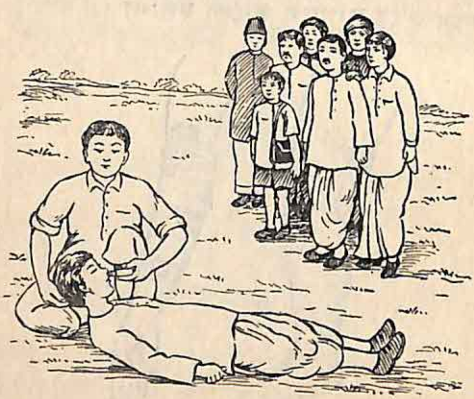


কিন্তু হাড় ভেঙ্গে গেলে বা স্থানচ্যুত হ'লে নিজেরা টানাটানি না ক'রে ডাক্তারের শরণ নেওয়া উচিত। হাড়টিকে যথাস্থানে বসিয়ে কাঠ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা বা প্লাষ্টার দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা ডাক্তারের পক্ষেই সম্ভব। ডাক্তার না আসা পর্যন্ত রোগীকে মুক্ত স্থানে শুইয়ে দিয়ে পাখার হাওয়া করা ও আহত স্থানে

বরফ লাগানো উচিত। রোগীর চারদিকে কেউ যেন ভিড় না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। রোগী একটু সুস্থ বোধ হলে, তাকে মধুসহ গরম দুধ পান করানো উচিত।

6. মূর্ছা যাওয়া বা ফিট হওয়া

আমাদের দেহে রক্ত সঞ্চালনের জন্য যেমন শিরা বা ধমনী ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবাহী নালী আছে তেমনি আমাদের সারা দেহের মধ্যে ছড়িয়ে আছে স্নায়ুতন্ত্র। স্নায়ুতন্ত্রের কাজ হ'ল দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, বেদনাবোধ, উষ্ণতাবোধ, স্পর্শানুভূতি, ভালোমন্দ, সুখদুঃখ বোধ প্রভৃতি সর্বপ্রকার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করা। অত্যধিক শ্রমে, অত্যধিক গরমে অথবা শারীরিক দুর্বলতায়, হঠাৎ আনন্দে বা হঠাৎ ভয়ে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে,—আমরা মূর্ছা যাই। অনেক সময় সামান্য জ্ঞান থাকে, অনেক সময় বাহ্যিক জ্ঞান একেবারেই লোপ পায়। চোখের দৃষ্টি ক'মে আসে, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, নাড়ীর গতিও মন্থর হয়ে আসে, শ্বাসকার্য ধীরে ধীরে চলে।



এরূপ অবস্থায় রোগীকে উন্মুক্তস্থানে শুইয়ে দিতে হবে। রোগীর চারপাশে যেন কোনো ভীড় না জমে। রোগীর চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া, পাখার হাওয়া করা, মাথায় জল দেওয়া প্রভৃতিতে ভালো ফল পাওয়া যায়। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলে গরম সেঁক দেওয়া ভালো। 'স্মেলিং সল্ট' ব'লে একরকম লবণ

পাওয়া যায়। তা রোগীর নাকের কাছে ধরলে উপকার পাওয়া যায়; রোগীর জ্ঞান ফিরে আসে। জ্ঞান দ্রুত ফিরে না এলে ডাক্তার ডেকে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

প্রশ্নাবলী

1. মটর গাছের বিভিন্ন অংশের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা কর।
2. মটর গাছের বিভিন্ন অংশের কাজগুলি বর্ণনা কর।
3. মশার জীবন-চক্র আলোচনা কর।
4. অ্যানোফিলিস্ ও কিউলেক্স মশার পার্থক্যগুলি আলোচনা কর।
5. 'বিশুদ্ধ জল ও পুষ্টিকর খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক'—উদাহরণসহ আলোচনা কর।
6. দেহ গঠনে ও সংরক্ষণে ব্যায়াম অত্যাবশ্যক কেন আলোচনা কর।
7. 'পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা' সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ।
8. 'কেটে যাওয়া' এবং 'হাড় মচকানো' এই দুইটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় কিভাবে প্রাথমিক সাহায্য দিতে হয় তা আলোচনা কর।
9. পুষ্টিকর খাদ্যের একটি তালিকা দাও।
10. চিত্রসহ মটর মূলের গঠন বর্ণনা কর।
11. মটর ফুলের গঠন চিত্রসাহায্যে বর্ণনা কর।
12. চিত্রসহ মটর পাতার গঠন ও তার বিভিন্ন কাজগুলি বর্ণনা কর।
13. কোন্ মশা কি রোগের বাহক? মশার উপদ্রব কি ভাবে নিবারণ করা যায়?
14. কয়েক প্রকার ব্যায়াম সম্বন্ধে আলোচনা কর।
15. স্বাস্থ্যের পক্ষে নিদ্রার আবশ্যকতা কি? কিভাবে নিদ্রা যাওয়া ভালো?
16. পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কি প্রকার অভ্যাস গঠন করা উচিত আলোচনা কর।
17. দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপায় ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা কর।
18. খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।
19. প্রতিদিনের প্রতিবেলার খাদ্য সম্বন্ধে একটি তালিকা রচনা কর।

অনুশীলনী

1. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) মটর গাছ —— পত্রী উদ্ভিদ।

(খ) মটর গাছের মূলকে বলা হয় —— মূল।

(গ) ধান গাছের মূলকে বলা হয় —— মূল।

(ঘ) মটরের পাতার আগার অংশ — রূপে গাছকে —— —— সাহায্য করে।

(ঙ) মটর ফুলের সবথেকে বড়ো পাপড়িটির নাম ——

(চ) —— মশা ম্যালেরিয়া রোগের এবং —— জাতীয় মশা —— রোগের জীবাণু বহন করে।

(ছ) —— গাছের রান্নাঘর বলে।

(জ) মটর ডাল মটর গাছের ——।

(ঝ) বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য প্রয়োজন —— —— ——।

(ঞ) মশার জীবনকালকে —— ভাগে ভাগ করা যায়।

(ট) মাছ, মাংসে বেশি পরিমাণে আছে —— জাতীয় খাদ্য।

(ঠ) যে খাদ্যের অভাবে আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধে ক্ষমতা ক'মে যায় তার নাম ——।

(ড) —— সর্বপ্রকার বিশ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(ঢ) পরিবেশ পরিচ্ছন্ন না থাকলে শরীর —— হয় কর্মে —— থাকে না, জীবন —— হয়ে ওঠে।

(ণ) মূর্ছিত ব্যক্তিকে —— —— শোঁখালে মূর্ছা ভাঙ্গে।

2. নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে যেগুলি ঠিক তার পাশে T এবং যেগুলি ভুল তার পাশে F লেখ।

(ক) মটর ফুলে মোট পাঁচজোড়া দল আছে।

(খ) মটরশুঁটি মটর গাছের ফল।

(গ) ভাবীমূল উপরের দিকে যায়।

(ঘ) মটর গাছের মূলে একপ্রকার গুটি বাসা বাঁধে।

(ঙ) বীজের কাজ হ'ল উদ্ভিদের বংশ রক্ষা করা।

(চ) পিউপা অবস্থায় মশা প্রচুর খাদ্য গ্রহণ করে।

(ছ) কিউলেক্স মশার ডানায় কালো কালো দাগ থাকে।

(জ) অ্যানোফিলিস স্ত্রী-মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে।

(ঝ) চর্বি জাতীয় খাদ্য দেহের অভ্যন্তরে রোগজীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা সৃষ্টি করে।

(ঞ) ব্যায়ামের পরে বিশ্রাম করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

(ট) নাক-মুখ ঢেকে শোওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

3. নিম্নলিখিত উক্তিগুলির পার্শ্বে লিখিত শব্দগুলির যেটি সবচেয়ে ঠিক ঐটি রেখে বাকীগুলি কেটে দাও :—

(ক) মশা আমাদের ক্ষতি করে কারণ, মশা বিরক্ত করে/রোগবীজাণু ছড়ায়/খাদ্য দূষিত করে।

(খ) ফুলের কাজ, গাছের শোভা বর্ধন/মধু সঞ্চয়/ফল সৃষ্টি।

(গ) গাছের পাতার কার্য, শ্বাসকার্য/ছায়াপ্রদান/খাদ্য সঞ্চয়।

(ঘ) ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তার করে, স্ত্রী অ্যানোফিলিস/পুরুষ অ্যানোফিলিস।

(ঙ) দেহগঠনে সবথেকে প্রয়োজন, চর্বি জাতীয় খাদ্য/ছানা জাতীয় খাদ্য/ লবণ জাতীয় খাদ্য।

(চ) আগুনে পুড়ে যাওয়া স্থানে লাগানো উচিত, নারিকেল তেল/বরফ/ টিংচার আইওডিন।

(ছ) মাটি থেকে খাদ্য শোষণ করতে উদ্ভিদের প্রধান সহায়, মূলত্রাণ/ মূলরোম/শাখামূল।

(জ) কাণ্ডের প্রধান কাজ, ফুল ফল ধারণ করা/খাদ্য সঞ্চয় করা/বংশ বিস্তারে সাহায্য করা।

(ঝ) মটর গাছের আকর্ষ, কাণ্ডের রূপান্তরিত অবস্থা/পাতার রূপান্তরিত অবস্থা।

(ঞ) অঙ্গার-আত্মকরণের ফলে উদ্ভিদ দেহের, ওজন বাড়ে/ওজন কমে।

(ট) মশা যে শ্রেণীর প্রাণী তাদের নাম, মেরুদণ্ডী/সন্ধিপদ।

(ঠ) যে অবস্থায় মশার আহার বন্ধ হয়ে যায় সেটি তাদের, পিউপা অবস্থা/ লার্ভা অবস্থা।

বিবিধ প্রশ্ন

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাও :—

(1) 'বায়ু মিশ্র পদার্থ' বলা হয় কেন ?

(2) 'জল যৌগিক পদার্থ' বলা হয় কেন ?

(3) কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস চুনের জল ঘোলা করে।

(4) নিঃশ্বাস বায়ু চুনের জল ঘোলা করে।

(5) শীতকালে নিঃশ্বাস বায়ু ত্যাগ করলে দেহের বাইরে এসে ধোঁয়ার সৃষ্টি করে।

(6) আবদ্ধ পাত্রে প্রাণী বাঁচতে পারে না।

(7) কই ও শিঙ্গি মাছ জলের বাইরেও অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে।

(8) কাঁচের গ্লাস জলপূর্ণ ক'রে কাগজ চাপা দিয়ে উপুড় করে রাখবার পর হাত সরিয়ে নিলেও জল প'ড়ে যায় না।

(9) বাসগৃহে ঘুলঘুলি রাখা হয় কেন ?

(10) লোহায় মরচে পড়ে কেন ?

(11) মরচে পড়াকে মৃদু দহন বলা হয় কেন ?

(12) সমুদ্রজল লবণাক্ত কেন ?

(13) পাতিত জল স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী নয়।

(14) মটর গাছ দ্বিদলবীজ শ্রেণীর উদ্ভিদ।

(15) পাতা রাত্রিকালে অঙ্গার-আত্মকরণ করতে পারে না।

(16) রাত্রিতে যে ফুলগুলি ফোটে ঐগুলি সাদা ও সুগন্ধযুক্ত হয়।

(17) 'অ্যানোফিলিস' পুরুষ মশা ম্যালেরিয়ার বীজাণু বহন করতে পারে না।

(18) কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হলে পানীয় জল ফুটিয়ে নিয়ে পান করা উচিত।

(19) ভিটামিন দেহের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপাদান।

(20) সুনিদ্রা সর্বপ্রকার বিশ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(21) 'মূর্ছা' যাওয়া রোগীকে 'স্মেলিং সল্ট' শোঁখানো উচিত।

(22) শুকনো গ্লাসে বরফ রাখলে গ্লাসের বাইরে জল জমে।

(23) উচ্চ পর্বতের শীর্ষদেশে তুষার জ'মে থাকে।

(24) ভূপৃষ্ঠের যত উপরে যাওয়া যায় ততই শীত বোধ হয়।

(25) প্রতিদিন আমাদের অনেকটা জল পান করা উচিত।

(26) একই ধরনের খাদ্য খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়।

(27) নিয়মিত পরিশ্রম দেহ গঠন করে।

(28) পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখা উচিত।

(29) গৃহ-পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত।

(30) শয্যা পরিষ্কার রাখা উচিত।

(31) নিয়মিত স্নান করা উচিত।

(32) গায়ের কাপড়ে আগুন লাগলে মোটা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরা হয়।

SYLLABUS IN GENERAL SCIENCE

For Class VII

Objective : To provide an elementary scientific classification and interpretation of some everyday phenomena.

A. *AIR*	**Demonstration and Experiments**
1. What is air made of ?	(a) Lime water experiment.
Simple experiments to show that air contains 1/5 volume of Oxygen and 4/5 volume of Nitrogen and traces of Carbon dioxide and water vapour.	(b) Absorbtion of oxygen by alkaline pyrogalic solution.
Simple experiment for detecting Oxygen and Carbon dioxide in air.	(c) Burning candle.
2. Air has weight.	Weigh a foot-ball bladder when inflated and deflated.
3. Respiration, living objects suffocate in air without oxygen.	To demonstrate how air enters the lungs.
Breathing of fish under water ; air pressure and breathing : drowning, artificial respiration.	Demonstration of artificial respiration.

4. Main principles involved in ventilation.

(a) Hot air rises and cool air sinks ;

(b) Methods of ventilating a room and a kitchen ;

(c) its role in the health of man.

5. Air develops force, does work—wind, kite, sail.

6. Rusting of iron :

(a) uses oxygen from air ;

(b) needs both oxygen and water.

	Demonstration and Experiments
7. Combustion : (a) burning substances use air. (b) compare combustion and usting.	
B. *WATER*	
1. Solvent action of water.	Preparation of solution of sugar and salt.
2. Evaporation : Condensation : rain cycle. Solidification.	
3. Purification of water : decantation, filtration, sterilisation. Crystallisation.	Sedimentation and decantation of muddy water : Filtration and distillation of sugar solution ; evaporation of saline solution.
C. *LIVING OBJECTS*	
1. Elementary observation of the different parts of pea : root, stem, leaf, flower, fruit and seeds, with reference to their functions in general.	Demonstration of various parts of pea plant and rice plant.
2. Life cycle of mosquito.	Charts showing ycle, models etc.
3. (a) Personal Hygiene : Pure water and wholesome food. Importance of exercise, sleep, proper habit formation as in clothing ; cleanliness of body and surroundings. (b) First aid in the house ; cuts, bruises, burns, stings, sprains, fainting.	

Chakravarti's General Science, Part II for Class VII, Bengali.

Price Re. 1·40 nP.